সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মৃগয়া

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

১৯৪২ সালে বাবা দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফটফটে চাঁদের আলোয় হাতিবাগানে জাপানী বোমা পড়া দেখলেন। জ্যাঠামশাই আমাদের নিয়ে একতলার শেলটারে নামতে নামতে বললেন, সাহস ভাল দুঃসাহস ভাল না। মনে রেখো পুরনো বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে আছ।

৪৩ সালে জ্যাঠামশাই দুরারোগ্য অসুখে শয্যাশায়ী হলেন। বাবা বললেন বেহিসেবী যৌবন কাউকে ক্ষমা করে না। ৪৪-এর পুরোটাই জ্যাঠামশাই বিছানায় পড়ে রইলেন। বাবা সংসারের হাল ধরে চতুর্দিকে দেনার বহর দেখে বললেন, "কাট ইওর কোট একডিং টু ইওর ক্লথ"। রোগীর জন্যে সকালে একদাগা মাছ, রাতে একটুকরো মাংস, প্রয়োজনীয় ওষুধ,একটু ফল, ডাক্তারের ফী, বাকি সকলের ...ত ভাত। বাইরে যুদ্ধের বাজার, ভেতরে অসুখের বাজার।

৪৫ সালে জ্যাঠামশাই আর পারলেন না। বাবার হাত ধরে বললেন, তোর বৌদি আর নাবালক ছেলেটা রইল, আমি চললুম রে। যাবার আগে কিছু ব্যাড ডেটসে তোকে জড়িয়ে রেখে গেলুম। ক্ষমা করিস। সোনাদানা যদি কিছু থেকে থাকে, বিক্রি করে শোধ করার ব্যাবস্থা করিস। বাবা বললেন, শ্রাদ্ধটা নমোনিত্যং করে সারবো, কিছু ভূত ভোজন করাবার কোনো মানে হয় না।

৪৬ সালে দুপুরে চিঠি এল বাবার ছোট ভগিনীপতি হঠাৎ এক স্‌পায়ার করেছেন। জায়গার নাম বাঁকুড়া। ভগিনীপতির ছোট ভাই তন্ত্রসাধনা করেন ভৈরবী নিয়ে। মাঝরাতে কারণবারি পান করে কাপালিক হয়ে যান। তখন খাঁড়া হাতে রোজই একবার করে বৌদিকে নরবলি দিতে চান। বুড়ো বাবা প্রতিবাদ করায়, পাঁজাকোলা করে পাতকুয়ায় ফেলে দিয়ে এসেছেন। আর তুলে আনেননি। বৃদ্ধের ডোবা-সমাধি হয়ে গেছে। ছেলে তার ওপর পঞ্চমুন্ডির আসন বসাবে। বুকবাজিয়ে বৌদিকে বলেছেন, মায়ের চেলা বিশু বিষয়ের জন্যে করতে পারেনা এমন কোন কাজ নেই। জগদম্বা আমার সহায়। কথা শেষে মিনিট পাঁচেক গা হিম করা তান্ত্রিক হাসি। ছোট বোন পরের ট্রেনে আসছে। সঙ্গে এক ছেলে, দুই মেয়ে। বাবা বললেন, বহুত আচ্ছা। বোঝার ওপর শাঁকের আঁটি। যুদ্ধের বাজার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সংসার এমনিই অচল। সবই ভগবানের খেলা। আরো একটু টানতে হবে। জীবনধারনের জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি নয়।

৪৬-এর দাঙ্গায় প্রভাত কাকার সাইকেলের দোকান পুড়ে ছাই হয়েগেল। অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেয়ে গেল একডজন সাইকেল আর ঢাউস একটা সাইনবোর্ড। একটা সাইকেলের হাতলে বড় বাঁশ বেঁধে, এদিকে ছটা ওদিকে ছটা সাইকেল জুতে, সাইনবোর্ড টাকে সামনে ট্রের মত রেখে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 'ট্রিকস রাইডার'কে হার মানিয়ে, প্রভাত কাকা এক দুপুরে সেই রাস্তা জোড়া সাইকেল ফ্রন্ট নিয়ে হাজির হলেন। পেছনে শ'দুয়েক লোক মজা দেখতে দেখতে আসছে। মালকোঁচা মারা কাপড়ের ওপর ফিনফিনে গরদের পাঞ্জাবি। সারা কলকাতায় বারোটা সাইকেল

সাইনবোর্ড সহ চড়ার কোন রেকর্ড নেই, হবেও না। সাইকেল থেকে নেমে বিনাপয়সার দর্শকদের হাসিমুখে অভিবাদন জানিয়ে কাকা বাড়িতে ঢুকলেন। বাগানের মাঝখানে সাইনবোর্ড টাকে চিৎ করে ফেলে, তার ওপর দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে হাঁকলেন, ছোড়দা এসে গেছি। আমরা দোতলার ভেতর-বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানে চিৎ সাইনবোর্ডটা পড়ে ফেললুম— প্রভাত জঙ্গপদ সাইকেল ওয়ার্কস।

বাবা বললেন, একসপেকট করেছিলুম, চলে এস ওপরে।

কাকা বললেন, দিস ইজ ফর দি থার্ড টাইম। গোমেদটায় কোনো কাজ দিচ্ছে না। গয়া ইজ হোপলেস। এবার একটা নীলা চাপাতে হবে।

বাবা বললেন, কপালে না থাকলে কিচ্ছু হয় না প্রভাত। তবে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। একলার ইনকাম, এই বাজার, এত লোক, সেকেণ্ডারি একটা ইনকাম চাই, আদারওয়াইজ বুঝতেই পারছ!

ঘরের কোন থেকে লম্বা গলা কুঁজোটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে হাত খানেক উঁচু থেকে এতখানি একটা হাঁ মুখে সের দুয়েক জল ঢেলে, ঢেউ করে বিশাল একটা ঢেঁকুর তুলে, কাকা বললেন—ওরে বাবারে একি গরম রে। তারপর বললেন, কোনো ভয় নেই ছোড়দা। ওই বারোটা সাইকেল আমার ক্যাপিটেল, আবার লাগাচ্ছি দেখুন না। এদিকটাও তো দেখছি জমে উঠেছে খুব। এখুনি বেরোচ্ছি একটা ঘরের খোঁজে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম যদি জল খাওয়াটা আর এক বার রিপিট করেন। মুখটা যেন গোমুখীর হাঁ। সামনে প্রহরির মত দুটো দাঁত। একটা আবার ঢকঢক করে নড়ছে। অবিচ্ছিন্ন ধারায় জল ঢুকছে, যেন উল্টো জাহ্নবী। প্রভাত কাকা আর জল খেলেন না। সারা ঘরে ডিঙ্গি মেরে মেরে বার কতক ঘুরলেন, মুখে একটা উফ্ উফ্ শব্দ, ওরে বাবারে, কি গরমরে বাবা। বাবা আবার অসহিষ্ণুতা পছন্দ করেন না। চশমাটা চোখ থেকে খুলে স্প্রিংয়ের খাপে ভরলেন, খট্ করে শব্দ হল। ফার্স্ট ওয়ার্নিং। কাকা তখনও নদের নিমাইয়ের মত ঘরময় ঘুরছেন। পায়ের কাছে কোঁচা লুটোচ্ছে। বাবা বললেন, প্রভাত, গরমকালে একটু গরম হবেই। সহ্য করতে শেখ আর তা না হলে লাটসাহেবের মত সিমলায় গিয়ে বসে থাক। কাকা তখন ঘরপরিক্রমায় একটা বাঁক নিচ্ছিলেন ফুস করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, সোজা নিচের উঠোনে। আমরা সবাই দোতলার ব্যালকোনিতে পোজিশান নিলুম।

বারোটা সাইকেলের এক একটাকে চ্যাংদোলা করে নিচের মালঘরে পুরে দিলেন। বাইরে রইল নিজের সাইকেলটা। সিটের ওপর দুবার চাপড় মারলেন। পা দুটো ফাঁক করে পঞ্চাশ ইঞ্চি ধুতির কোঁচাটা পেছনদিকে এক ঝাপটায় ছুড়ে দিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে পেছন থেকে ধরে নিলেন, তারপর সোজা হয়ে, দু'পা কাঁচির মত করে ডাইনে বাঁয়ে নেচে নেচে মালকোঁচা মারলেন। সামনের জামাটা দু'হাত দিয়ে সমান

করে আমাদের দিকে তাকালেন। সারি সারি উৎসুক মুখ। ওপরের গজদন্ত দুটো দিয়ে তলার ঠোঁটটা চেপে ধরে ভীষণ একটা মুখভঙ্গী করলেন, তারপর স্যাংচু মারি খ্যাং খেলি বলে সাইকেলটাকে প্রায় ঘাড়ে তুলে, পেছল উঠোনের ওপর দিয়ে অবিশ্বাস্য কায়দায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল সদ্য-আগত প্রায় সমবয়সী পিসতুতো ভাই। সে মুখটাকে গোব্দা মত করে বলল—পাগল বটে। পাশে দাঁড়ানো তার দিদি, ভাইকে সংশোধন করে দিল—খ্যাপা বটেক।

জ্যাঠাইমা সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে মন্তব্য করলেন, ঠাকুর-ঝি ছেলে-মেয়েগুলোকে গেঁইয়া করে রেখেছে। কাকে কি বলতে হয় তাও একেবারে শেখেনি। অত বড় একটা লোককে খ্যাপা বলছে। ঠাকুরঝি তখন বারান্দার এক কোনে বসে ছোট মেয়ের চুলে, দাঁড়া-ভাঙা চিরুনি চালিয়ে জট ছাড়াচ্ছিলেন। মেয়ে মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছিল, লাগে বটেক, লাগে বটেক। সেই অবস্থাতেই জ্যাঠাইমার মন্তব্য তার কানে গেল। মুখটা একটু গম্ভীর হল মাত্র। পাল্টা জবাব কিছু দিলেন না। সংসারে তাঁর স্থান তখনো ঠিক হয়নি। সবে এসেছেন। ভাসমান অবস্থা। প্রায় এক কাপড়েই চলে এসেছেন । সঙ্গে অ্যাসেট কিছুই নেই। সবই লায়বিলিটিজ। বড় মেয়ে প্রায় বিবাহযোগ্যা। রূপও নেই, বিদ্যেও নেই। ছেলে সেভেনে পড়তে - পড়তে চলে এসেছে। ছোট মেয়ের সবে অক্ষর পরিচয় হয়েছে। সম্পত্তির মধ্যে একটা গোলাপ ফুল মার্কা সুটকেস। সুটকেসে কি আছে তখনো অপ্রকাশিত। গোল গোল কালো হাতের একটায়, একটা চিঁড়েচ্যাপ্টা সোনার বালা। তাতে কতটা সোনা আছে, বাঁধা দিলে বা বেচে দিলে কত টাকা আসবে স্বর্ণকারের কষ্টিপাথরই তা বলতে পারে।

সন্ধ্যের ঘরে তখনো আলো পড়েনি। এ তল্লাটে একমাত্র আমাদের বাড়িতেই ইলেকট্রিক ছিল না। টাকার অভাব, উৎসাহও তেমন নেই। ভূতের বাড়িতে রাতটা যেন আরো ভূতুড়ে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির চাতালে বসে চারটে হ্যারিকেন নিয়ে তখনো বাবার কেরামতি চলেছে। সপ্তাহান্তিক পরিচর্যা। পলতে ট্রিমিং, চিমনি পলিশিং। পলতে নিখুঁত গোল করে কাটা আর গোঁফ ছাঁটা দুটোই সহজ কাজ নয়। একবার করে ছাঁটছেন আর জ্বেলে দেখছেন শিখাটা ঠিক গোল হচ্ছে কি-না। প্রতিবারই হয় এপাশে না হয় ওপাশে একটু করে অবাধ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে। জ্যাঠাইমা দক্ষিণের ঘরের মেঝেতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাতপাখা নাড়ছেন। একটা-দুটো মশা গুনগুন করছে। একসময় পাখা নাড়া বন্ধ করে, ফিস ফিস করে আমাকে বললেন, একেবারে ছানাপোনা নিয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। বাবুর আর কি! আর একটু টানবো আর একটু টানবো করে পরনের কাপড়টাই প্রায় বেরিয়ে যেতে বসেছে। একে কন্ট্রোলের বাজার! উনি যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, মা-মরা ভাইপো আর আমার বৌ-মরা ভাইটাকে একটু দেখ। ওঁকে কে দেখবে বাবা! যা মেজাজ। এইবার বোন এসেছে ভাল করে দেখুক। আমি এবার মানে মানে সরে পড়ব বাবা।

জ্যাঠাইমার চিরকালই বুক ধড়ফড়ের অসুখ। কথাকটা বলেই সেই ভর সন্ধ্যেবেলা পাশ ফিরে শুলেন। বুকটা কেমন করছে। মাথার রগ দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ইদানীং তেমন মধুর যাচ্ছিল না। বাবার ধারণা জ্যাঠামশাই আরো কিছু দিন জীবনটাকে টানতে পারতেন। জ্যাঠামশায়ের জীবনের রশি জ্যাঠাইমাই আলগা করে দিয়েছেন। জ্যাঠাইমার আবার ধারণা তিনি 'চিটেড' হয়েছেন। জ্যাঠাইমার বাবা কেবল বড় বংশটাই দেখেছিলেন। জামাইকে দেখেন নি। দোজ'পক্ষ। কলপ-লাগানো চুল উল্টে দেখা উচিত ছিল, তাহলেই ধরা পড়ত ভিতরের আসল পাকা চুল। বুকটা বাজালেই ধরা পড়ত ফুসফুসের অবস্থা। পড়তি জমিদার হলেও জমিদার বংশের সুন্দরী মেয়ে। এতো বিয়ে নয়, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ঝপাং করে। এদিকে জ্যাঠাইমার নাক ডাকতে শুরু করেছে ফুড়ুত ফুড়ুত। যতক্ষন জেগে থাকেন রাগে ফোঁস ফোঁস করেন। যতক্ষন ঘুমোন ততক্ষন ফুড়ুত ফুড়ুত করেন। কার্য এবং কারণ দুটোই ফুড়ুত করে সরে পড়েছে। জ্যাঠাইমার বাবাও আর নেই, জ্যাঠামশাইও নেই। এখন চলেছে তলানির লড়াই। বাবা আর জ্যাঠাইমা মুখোমুখি। অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের পর্বটা যতদিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে।

অথচ বাবাই জোর করে জ্যাঠামশাইকে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহনে বাধ্য করেছিলেন। প্রথমে মা মারা গেলেন, তারপরে গেলেন প্রথম জ্যাঠাইমা। জেনানা শুন্য পরিবারে রাঁধুনি আর ভৃত্যদের ভূতের নৃত্য। অস্পষ্ট মনে আছে দুই ভায়ে রোজ রাতে দিনকতক জোর সিটিং চলল। মেজ বললেন, তোমার আগে গেছে তুমি কর। ছোট বললেন, পাগল হয়েছ সৎমা এসে আমার একমাত্র ছেলেটাকে পর করে দিক আর কি। স্টেপ মাদার আর জেনারেলি ডেনজারাস মাদার। তুমি নিঃসন্তান তুমি বরং রিসকটা নিতে পার। দুটো পারপাসই সার্ভ করবে। হাতও হবে হাতাও হবে।

পাশের ঘরটাই বসার ঘর। বসার ঘরে আলো এল। টেবিলের ওপর ঠক করে হ্যারিকেন রাখার শব্দ হল। ওটা আমার পড়ারও ঘর। দিকে দিকে সন্ধ্যের শাঁখ বাজছে। আকাশের অন্ধকার জমি ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে। তারার চুমকি সংখ্যায় বাড়ছে। দরজায় ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এ-ঘরেও চুরি করে ঢুকেছে। এ-ঘরে স্বতন্ত্র কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। ঘুমের ঘরে থৈ-থৈ অন্ধকারই ভাল। যে চার বছর জ্যাঠামশাই বেঁচে ছিলেন সেই চার বছরই জ্যাঠাইমা জেগে-ছিলেন। তখন ঘরে সেজ জ্বলতো আয়নায় আলো চমকাতো, ইজিচেয়ারে বসে থাকা জ্যাঠামশাইয়ের আঙুলে সিগারেটের আগুন টিপটিপ করত। খাটের ছতরিতে জ্যাঠাইমার লাল সিল্কের শাড়ি ভাঁজে ভাঁজে ঝুলতো। ফর্সা কপালে কাঁচ পোকার টিপ চিকচিক করত। কখন কখন সুরেলা গলায় গান শোনা যেত, নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছাড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। কন্ট্রোলের সরু কালোপাড়, মোটা,

কোরা, আধময়লা ধুতি পরে জীবন্মৃত জ্যাঠাইমা এখন অন্ধকার ঘরে কুমড়ো-গড়াগড়ি।

পাঁচ বছর আগে এই জ্যাঠাইমাকেই পাকা দেখতে গিয়েছিলুম আমি। জ্যাঠামশাই আন্ডার কমপালসন বিয়ে করছেন, ঠিক বিয়ের জন্যে নয় আমাকে দেখাশোনা করার জন্যে। সুতরাং পছন্দের দায়িত্ব আমার। আমি আমাদের বৃদ্ধ কুলপুরোহিত আর আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড যাঁকে আমি মাস্টার জ্যাঠামশাই বলতুম, শরতের হুডখোলা গাড়ি চেপে জ্যাঠাইমাকে পাকা করতে চললুম। জ্যাঠামশাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে আমার সে কি খাতির! জ্যাঠাইমার গেঁট্টা গোঁট্টা ছোট বোন আমাকে পাঁজা-কোলা করে একেবারে বার মহল থেকে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে, ঠ্যাং ভাঙা আরশোলার মত ছেড়ে দিলেন—এই দেখ্, দিদি তোর দেওরপো। 'উড বি' জ্যাঠাইমা তখন আবছা আলোয় সাজগোজ করছিলেন। ভেতরের জামাটা সবে পরা হয়েছে। সেই অবস্থায় একবার ঘুরে দেখলেন। গোলগোল, লম্বা চওড়া গেলাপী চেহারা। আমাদের বাড়ির পুরুষরা সকলেই কালো কালো। জ্যাঠামশাই আবার একটু শীর্ণ। ঈষৎ কোলকুঁজো। মাথার সামনে দুপাশে টাক । জ্যাঠাইমাকে মনে হল রাজরানী। সেই বয়েসে রূপের আর কি বুঝি! যতটুকু বুঝি তাইতেই আমি মুগ্ধ। এরপর জ্যাঠাইমা যখন আমাকে বুকে তুলে নিয়ে একটা হাম খেলেন তখন আমি প্রায় ঠিক করে ফেলেছি জ্যাঠাইমা মাইনাস করে মা-ই বলব। বাড়ি ফিরে এসে এতই উচ্ছাস, জ্যাঠাইমার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে একঘর লোকের সামনে এমন একটা জায়গার বর্ণনা দিলুম বাবা ছি ছি করে লাফিয়ে উঠলেন. যেন কৌরবের সভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। জ্যাঠামশাই যুধিষ্ঠিরের মত মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। এখন বুঝেছি মা আর জ্যাঠাইমায় কত তফাৎ! একমাত্র বাবার স্ত্রীই মা হতে পারেন। আর কেউ না।

সেই রাজরানী এখন মেথরানী হয়ে মেঝেতে কাত। হাতে যেয় তালপাতার পাখা। কোথায় সেই ফিরোজা রঙের সিল্কের শাড়ি! কোথায় সেই চন্দ্রচূড়, ব্রেসলেট, টিকলি। সর্ব অঙ্গ সব সময়েই জ্বলে গেল জ্বলে গেল। রাগে না পিত্তিতে। বোধহয় রাগে। রাগটা স্বভাবতই বাবার ওপর। বাবার দলে এতকাল কেউ ছিল না। জ্যাঠাইমা একলাই লাঠি ঘোরাচ্ছিলেন। এখন পিসিমা আসায় বাবার দল ভারি হয়েছে। একে নিঃসহায়, আশ্রিতা তার ওপর মার পেটের বোন। জ্যাঠাইমা শুরু থেকেই সংসারে কোণঠাসা। বাবাকে সন্তুষ্ট করা অত সোজা নয়। জ্যাঠামশাই প্রথামত বিয়েটাই করেছিলেন। কথা ছিল জ্যাঠাইমা হবেন সংসারের সম্পত্তি। গঙ্গার ঘাট কিম্বা টাউন হলের মত। কারুর একার দখলিস্বত্ব চলবে না। জ্যাঠামশাই কথায় কথায় বলতেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরোনা, ওকে কর। বাপের বাড়ি যাবেন কি-না, তাও। পুরনো ডিজাইনের হার ভেঙে নতুন করা হবে কি-না, তাও। একদিন ভায়েদের খেতে বলবেন কি-না,ও। রাতে চর্বি দিয়ে আলুর দম হবে কি-না,ও।

এমন কি রাতে শোবার ঘরের দরজা খিল পড়বে কি-না, ও। জ্যাঠাইমা একদিন চিৎকার করে উঠলেন সবই যখন ও তুমি তাহলে ও না হয়ে ঐ হলে পারতে। আমি ও ঘরে গিয়ে তোমাদের 'ও'র পদসেবা করি, আর তোমাদের শিবরাত্রি সলতে দেবরপোকে কোলে ফেলে সারা রাত থাবড়াই, আয় ঘুম, যায় ঘুম। জ্যাঠামশাই হিসহিস করে উঠেছিলেন, আস্তে আস্তে, ছি-ছি নন্দিনী এসব কি কথা, দেয়ালেরও কান আছে মাই ডিয়ার।

আমাদের বাড়ির চল্লিশ ইঞ্চি পুরু দেয়ালেরও কান আছে। বাবার ডোমিনিয়ানে স্পাই সিসটেম বেশ শক্তিশালী ছিল। বাবার চোখও ছিল—কমপাউন্ড আই। কিছুই দেখছেন না যেন, অথচ সব দেখছেন এমন কি 'ক্লেয়ারভয়' ও বলা চলে। ভবিষ্যতেও দৃষ্টি চলত। বামুনদি আড়ি পেতে জ্যাঠাইমার সংলাপ শুনে গেল। রাতে লোহার মত শক্ত হাতে ছোটবাবুর সাইটিকার কোমর পাঞ্চ করতে করতে মেজ বৌদির মন্তব্য শুনিয়ে দিল। বাবা দেয়ালে ঝোলান প্রথম বৌদির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তারস্বরে তিনবার তারা, তারা, তারা বললেন, তারপর জিভে ও তালুতে জড়াজড়ি করে একরাশ অব্যয়, সাবানের বুদবুদের মত হাওয়ায় ছেড়ে দিলেন, ছ্যাক ছ্যাক। শেষে একটু সু-সু যোগ করলেন-আহা আহা কি সব সতী সাবিত্রীই না ছিলে তোমরা। হায় রাম এ কি করলে, শেষটা একি করলে, ছো-ছো, পাশের ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের 'ভার্ব্যাল পথ্য' ভালই হল। অম্ল মধুর, ত্রিফলা জাতীয় পার্গেটিভ। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে আন্দাজ করে পাছায় চুলকুনির পাউডার ঘষতে গিয়ে এক খামচা সিঁদুর মেখে একপাশে কাত মেরে পড়ে রইলেন। জ্যাঠাইমা সারা রাত হাতের তালু দিয়ে নাক ঘষে ঘষে তাঁর সেই ফেমাস আওয়াজ বের করলেন যেটা খুব সর্দিতেও করেন আবার কান্নার সময়েও করে থাকেন।

জ্যাঠাইমা সম্পর্কে বাবার সার্টিফিকেট আর পালটালো না। সাবস্ট্যান্ডার্ড ছাপ পড়ে গেল। আগমার্কা নয়, অগামার্কা। অগামার্কা জিনিস এই দ্বিতীয় পক্ষটি। আগের দুই বৌ ছিলেন হাইক্লাস। দু'জনেই ডিসটিংশান নিয়ে দেহ রেখেছেন। ইনি কিছুই পারেন না, কিছুই জানেন না। ঘন ঘন সর্দি হয়। জোরে জোরে হাঁচেন। আঁচলে নাক ঝাড়েন। আগের দু'জন মাঝে মধ্যে হাঁচলেও ফিঁচ করে একটা মিঠে শব্দ হত। সাইলেনসার লাগানো নাক ছিল। ইনি বাথরুমে ঢুকলে আর বেরোতে চান না এবং ইনভেরিয়েবলি যে-কোন একটা অন্তর্বাস ভেতরে ফেলে রেখে আসবেন। শুধু তাই নয়, ইনি ঘুম প্রধান, রাগ প্রধান, তমোগুণী এবং নাক ডাকে।

চরিত্র সংশোধনে জ্যাঠাইমার কোন উৎসাহই দেখা গেল না। তিনি সার কথাটি জানতেন—স্বভাব না যায় মলে। ঠাকুরপোর স্বভাব ছেঁদা খোঁজা। আমার স্বভাব, সে তো জানই। তবে চলছে চলুক। ঘুমটা প্রকৃতই তাঁর হাতধরা ছিল। ঘুম, আধ কপালে আর বুক ধড়ফড় এই তিনটে জিনিস পালাক্রমে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের মত ছাড়তে লাগলেন। আধ কপালে হলেই ঘুম, ঘুমোলেই আধ কপালে, উঠে দাঁড়ালেই বুক

ধড়ফড়। শরীরটাকে শুইয়ে রাখাই ভাল। ডগ ট্রেনারের কাজ কি? ট্রেনিং দেওয়া। স্বামীর কাজ কি? স্ত্রীর-পিঠে জিন এঁটে, নাকে ফুঁটো করে লাগাম পরিয়ে হ্যাট ঘোড়া হ্যাট, ডাইনে চল, বাহিনে চল। তবেই না তুমি স্বামী! বাবা জ্যাঠামশাইকে বললেন, তুমি একটি 'হেন-পেকড'। জ্যাঠামশাইয়ের শরীর তখন পোড়ো বাড়ির মত ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রতিবাদ করার মতও শক্তি নেই। তিনি হয়তো বুঝতেই পেরেছিলেন হাতের তাস যে ভাবেই খেলুন হারতে তাঁকে হবেই। জানতেন যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট একটু সহ্য করতেই হবে। ছোট ভাইয়ের মেজাজ একটু তিরিক্ষি কিন্তু সে অবশ্যই একজন গুড অ্যাডমিনিসট্রেটার। মুদিখানার দোকানে তাঁর আমলের হাজার খানেক টাকার মত ধার প্রায় শোধ করে এনেছে। কয়লার দোকানের দেনা শোধ। রোজ সকালে গোয়ালার তাগাদা নেই। কড়া হাতে সংসারের স্ট্রিয়ারিং ধরেছে। 'হেন-পেকড' জ্যাঠামশাই মরে যাওয়া চোখে কিছুক্ষণ ছোট ভাইয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে গিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে বিছানায় পড়লেন।

অন্ধকার ঘরে দেয়াল আয়নাটাই কেবল চকচক করছে কোথা থেকে আলো চুরি করে। জ্যাঠামশাইয়ের শির বের করা কপালে হাত রাখলুম। সেই বয়েসেই এই বোধটা হয়েছিল, বাবার অপরাধ, বাবার দেওয়া দুঃখের দায় ভাগের কিছু অংশ আমারও। কপালটা বেশ গরম। আমার হাতের স্পর্শে জ্যাঠামশাই চমকে উঠেছিলেন। বাপি, তুমি। আঃ, তোমার হাতটা কি সুন্দর ঠান্ডা! ও কতদিন পরে কেউ আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। জ্যাঠামশাই কাত হয়ে বসে বললেন, না তার জন্যে নয়, আমার অসুখ তো, অসুস্থ লোকের কাছে বেশি না আসাই ভাল।

আমার যখন অসুখ করে তখন আপনি যে কত আমার সেবা করেন। এইবার শোধবোধ হয়ে যাক। জ্যাঠামশাই মৃদু হেসে বললেন—ধ্যুর ব্যাটা, আমি যে তোমার জ্যাঠা! কত বড় আমি! তোমার অসুখে আমাকে তো সেবা করতেই হবে, তা না হলে তুলসী-চপলা আমার উপর রাগ করবে না! রাগ করে কথাই বলবে না। তুলসী আমার মার নাম, চপলা আমার প্রথম জ্যাঠাইমা।

—ওঁদের সঙ্গে ? আপনার দেখা হবে কি করে?

—আমি যখন যাব। তখন ওরা জিজ্ঞেস করবে বাপি কেমন আছে ? কত বড় হয়েছে? মোটাসোটা হয়েছে কি-না?

—আমিও যাব আপনার সঙ্গে। কতদিন দেখিনি।

—দূর বোকা যাব বললেই যাওয়া যায়। না ডাকলে যাবে কি করে ? না এসব কথা ভাল নয়। —তাহলে আসুন এক গেম ক্যারাম বোর্ড খেলি। আলোটা নিয়ে আসি ও ঘর থেকে।

—আমি যে বসতে পারছিনা বাপি।

—তাহলে একটা মজার গল্প বলবেন, সেই গল্পটা, বোয়াল মাছের।

—ওঃ হো সেইটা, তোমার মনে আছে এখনও। আমার যে কথা বলতে কষ্ট

হচ্ছে বাপি। আমি ভাল হয়ে উঠি, তোমাকে অনেক গল্প শোনাব।

—তাহলে আমি হাত বুলিয়ে দি।

হঠাৎ জ্যাঠাইমা এসে এমন কান্ড করলেন যার ক্ষত আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন শুখোবেনা। জ্যাঠাইমা একটা ধুনচি হাতে ধুম্রশ্বরীর মত ধরে ঢুকলেন। মুখটা ধোঁয়ায় ঢাকা। মাঝে মাঝে স্পষ্ট হচ্ছে। জ্যাঠামশাই বললেন, একি, একি আমার ঘরে ধুনো কেন, ঠাকুর ঘরে দাও। জ্যাঠাইমা ঠক্ করে ধুনচিটা এককোণে রাখলেন। সেটা আবার সোজা বসতে পারে না। নিজের ভারে একপাশে কাত হয়ে গেল। জ্বলন্ত একটুকরো ঘুঁটে অল্প একটু ফুলকি ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। পাখা হাতে জ্যাঠাইমা উঠে দাঁড়ালেন। ধোঁয়ায় আমাদের চোখ গলা জ্বালা করছে, জ্যাঠামশাই একটু কেশে উঠলেন। আমি বলতে গেলুম, ধুনোটা সরিয়ে দিন জ্যাঠামশাইয়ের কষ্ট হচ্ছে।

জ্যাঠাইমা পাখা নেড়ে নিজের মুখ থেকে ধোঁয়া পরিষ্কার করছিলেন, ফোঁস করে উঠলেন, —তুমি এখানে কেন, এ ঘরে কি হচ্ছে, যাও ও ঘরে যাও। বংশে বাতি দাওগে যাও।

মুখটা আমার কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। অভিমানটা চিরকালই আমার বেশি। বাতি দাও গে-যাও কথাটা হাত নেড়ে আঙুল উঁচিয়ে এমনভাবে বললেন, অনেকটা সামনের বস্তিবাড়ির গোলাপীর মত করে। জ্যাঠামশাই বললেন, ছি-ছি নন্দিনী, তুমি একি করছ, তুমি ওর মার মত। ওর কি দোষ!

—রাখ রাখ, সারা জীবন তো দরদে উথলে উঠলে, এর চাকরি, ওর মেয়ের বিয়ে, ভাই, ভাইপো তাতে তোমার কি হল শুনি। তোমার প্রাণের ভাইতো টি বি, টি বি করে লম্ফ ঝম্ফ শুরু করেছেন। তোমার আলাদা থালা, গেলাস, বাটি। এই মাত্র ব্যবস্থা দিলেন রুগীর ঘরে গরুর গোয়ালের মত সাঁজাল। শুধু ধুনোতে হবে না, এক পুরিয়া গন্ধকও থাকবে। সেই মানুষের ছেলে তোমার পাশে বসে। নিঃশ্বাসে রোগ ছাড়াবে না? এখুনি বলবেন ছেলে মারার প্ল্যান হয়েছে। যিনি নিজে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে শুকন দরদ দেখান, তাঁর ছেলে চৌকাঠের এদিকে। যাও, যাও, যাও।

জ্যাঠামশাইয়ের খাট থেকে নেমে এলুম। যাও-যাও বলে যেন কুকুর তাড়াচ্ছেন। সেই আমি শেষ জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিলাম। আর ঢুকিনি। অভিমানে কথা বলিনি। শুধু দেখতুম দিনে দিনে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমাদের এক আত্মীয় ডাক্তার বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করতেন। শেষের কয়েকদিন আগে, একজন বড় ডাক্তার এসেছিলেন বিশাল গাড়ি চেপে। গাড়ির রং আর জুতোর রং একইরকম। ঝকঝকে বাদামী রঙের ছুঁচ মুখো জুতো। মিনিট কুড়ি ছিলেন। গম্ভীর মুখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলেছিলেন, শেষ সময়ে বড় ডাক্তার ডেকে লাভ কি? আর ক'দিন?

সেইদিন থেকেই জ্যাঠাইমার কান্না শুরু হল। বাবা বললেন, বাঙালী মেয়েরা নার্সিং জানে না। কেঁদে কেঁদেই মৃত্যুটাকে এগিয়ে নিয়ে এল। ইংরেজ মেয়ে হলে দেখিয়ে দিত। একদিন সকাল নটার সময় ফুসফুসে হাওয়া নেবার জন্যে জ্যাঠামশাই হাঁ করে বার কতক আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। বালিস থেকে মাথাটা কয়েকবার উঠে গেল, তারপর ধপাস করে একবার পড়ে ডানপাশে কাত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোল বেয়ে একবিন্দু জল গড়িয়ে এল। সেই সময় ঘরে কেউ ছিল না। আমি পাশের ঘর থেকে দেখেছিলুম। একটু পরেই জ্যাঠাইমা ঘরে এলেন হাতে ফিডিং কাপে লেবুর রস। এক মিনিটের জন্যে সেই রস আর জ্যাঠামশায়ের খাওয়া হল না। তিন মাস আগে। শেষ, সেই সন্ধ্যায় বাপি বলে আমাকে ডেকেছিলেন। বিশাল বোয়ালের গল্পটা আমার আর শোনা হল না। 'জ্যাঠামশাই' বলে তিন মাসের অভিমান আর ব্যবধান ভুলে আমি যখন ঘরে লাফিয়ে পড়লুম সেই ডাকে 'কি বাপি' বলে সাড়া দেবার জন্যে তিনি আর নেই।

বাবা বললেন খাট নয়, খাটিয়া। ফুলের তোড়া নয়, কিছু কুঁচো ফুল। অগুরুর কোন প্রয়োজন নেই। এক প্যাকেট ধূপ স্যাংসানড। আসল যাত্রা শুরু হবে চিতা থেকে, তার আগে যে কোন আড়ম্বরই বাড়াবাড়ি। যে বাজার তাতে বাড়াবাড়ি সাজেনা। আসল দায়িত্ব পেছনে পড়ে আছে। মৃত্যুর মধ্যে কোন গ্ল্যামার নেই। মৃত্যু হল সবচেয়ে বড় পরাজয়। 'হরি বোল' খুব চাপাস্বরে উচ্চারণ করবে মাঝে মাঝে, সারাটা পথে বার চারেকের বেশি নয়। সব যাত্রীরা প্রায় নিঃশব্দে চলে গেলেন। জ্যাঠাইমার হাতের শাঁখা ভাঙার জন্যে দুই প্রতিবেশী মহিলার মধ্যে কলহ বেঁধে গেল। মঞ্জুর মা বললেন, আমি সারা জীবনে অন্তত দ'ুডজন শাঁখা ভেঙেছি, আমি হলুম গিয়ে ইসপার্ট। রবির মা বললেন একসপার্ট উচ্চারণ করতে পার না। ইসপার্ট বল, তুমি যে কেমন একসপার্ট বোঝাই গেছে. দিদিকে আমি গঙ্গার ধারে সাবধানে ধরে ধরে নিয়ে যাব, তারপর মাঝারি গোছের একটা পাথর দিয়ে ফুট করে শাঁখা ভেঙে বিধবা করে দেব। বামুনদি এই ভীষণ সমস্যার সময় আর এক সমস্যার সৃষ্টি করল, কেবলই বলতে লাগল, মেজবাবু মরে গেছে আমি বিশ্বাসই করিনা, মেজবাবু মরতে পারেনা। ডিমের কারি খাব বলেছিল। আহা গো, ডিমের কারি।

একবার এক মহাপুরুষ ঘন্টাখানেকের জন্যে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। দাদুর গুরু। বাসস্থান হিমালয়। বছরে একবার সংসারে হালচাল দেখার জন্যে সমতলে নেমে আসেন। বড়বাজারের তুলোপটিতে দিন কতক থেকে আবার হিমালয়ে গিয়ে উঠেন। বেঁটে খাটো সাত্ত্বিক চেহারা। বসার ঘরে শ্বেতপাথরের টেবিলে এসে বসলেন। পেতে দেওয়া হল কম্বলের আসন। দুটো বিশাল রাজভোগের একটা থেকে একটু খুঁটে তুলে নিলেন। বাকিটা প্রসাদ। কথা খুব কম

বললেন। সারাদিনের আহার একপো দই, দু'চামচ চাক ভাঙ্গা মধু। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এই আহারে শরীর থাকে কি করে?

সন্ন্যাসী বললেন, শরীরের ক্ষয় রোধ করতে পারলে আহারের কোন প্রয়োজন হয় না। শরীরের তিনটে দ্বার বন্ধ করে দিতে পারলে, বাস কেল্লা মার দিয়া। মেটেরিয়াল ওর্য়াল্ডের ওপর মহারাজ হোকে বৈঠ যাও। বেটা! যোগ কর্মসু কৌশলম।

এত বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করে ন্যাকড়ার জুতো পরে সন্ন্যাসী গটগট করে চলে গেলেন। রাজভোগ দুটো শ'খানেক টুকরো হয়ে প্রায় মৌলিক পদার্থ হয়ে গেল। আমরা সেই পিঁপড়ে ভোগের আস্বাদ পেলাম।

আমার ম্যাথমেটিসিয়ান পিতৃদেব কাগজে কলমে প্রমাণ করে দেখালেন, তুমি যদি রোজ দু'টাকার মত খাও এবং যদি হজম করতে না পার, তাহলে থ্রিফোর্থই দাস্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে। তার মানে দেড়টাকা টাট্টিখানায় নামিয়ে দিয়ে এলে হুইচ ইজ এ কাস্টলি লস। অথচ ওয়ানফোর্থ খেয়ে যদি পুরোটাই হজম করতে পার তাহলে সকালে দুটি সায়েবী গুটলে বেরবে, কম খরচে বেশি পুষ্টি। ক্ষয়ের একটা দ্বার বন্ধ হল। দ্বিতীয় দ্বার মুখ। মুখ বন্ধ কর। কম কথা, প্রয়োজনের বেশি একটি কথা নয়। মহাত্মা গান্ধী সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকতেন। তুলসীবাদী সম্প্রদায়ের সাধুরা মুখে প্ল্যাস্টার লাগিয়ে ঘোরেন। জীবনস্মৃতি পড়ে দেখ শিশু রবীন্দ্রনাথের পাতে বাড়ির ঠাকুর মাত্র চারখানি লুচি, একটি একটি করে দুলিয়ে দুলিয়ে ফেলে দিতেন, অ্যান্ড নো মোর। ওই দেখ অলেস্টারপরা রবি ঠাকুরের ছ'ফুট বিশাল চেহারা।

কিসে হয়েছে? মিতহার, মিতবাক আর কুস্তিতে। ব্যায়াম চাই। গাদাগাদা খাব আর ওই-ঘরের মত ভোঁস-ভোঁস ঘুমোব, এ 'লাকসারী এখন আর চলেনা। ওঘর মানে জ্যাঠাইমা। তৃতীয় দ্বার বন্ধ করার বয়স এখনো তোমার হয়নি। সে দ্বার এখনো বন্ধ আছে। খুলবে যৌবনে, তখন সাবধান হতে হবে।

সুতরাং ব্যায়াম। জ্যাঠাইমা শুয়েছিলেন রাস্তার দিকের দক্ষিণের ঘরে। পূবের দরজা বন্ধ। খুললেই লাগোয়া বসার ঘর। উত্তরের দরজা খোলা। উত্তরে জানালা শূন্য ঠাকুর ঘর। আলো ঢোকেনা বলে অন্ধকার ঘর। অন্ধকার ঘরের দিকে জ্যাঠাইমার পা। গুরুজন তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি শোবার ধরনটা বড় বিশ্রী। পায়ের পাতার ওপর হাঁটু দুটো দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরের ঠাকুর ঘর থেকে পূবের দরজা দিয়ে বেরোলে বড় ঘর। ওই ঘর, আমার আর বাবার। পূবে দরজা দিয়ে বাবা দুম করে উত্তরের কাচ নামলেন। উচুঁ চৌকাঠ। ডিঙোতে হয় বলে শব্দটা হল। তাছাড়া বাবা দুম দাম একটু ভালবাসেন। দুমের সঙ্গে গলা খ্যাঁকারি। বাবা জানেন দক্ষিণের ঘরে জ্যাঠাইমা আছেন এবং সেইভাবে আছেন পা উঁচু করে। উত্তরের দরজার একটা পাটি বাবার অদৃশ্য হাতের ঠেলায় বন্ধ হল অপরটা বন্ধের জন্যে. লোমশ

হাতের একটা অংশ পাশ থেকে বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় পাটি টা বন্ধ হতে হতে আদেশটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন—চলে এস—হারি আপ!

ঠাকুর ঘরের এককোণে দুটো মুগুর ঘাড় কাতকরে দুই দারোয়ানের মত দেয়ালে ঠেসান দিয়ে জড়াজড়ি করে বসে আছে। তাকের ওপরও দুটো করে ডাম্বেল ওজনে হালকা। পরপর কয়েকটা স্টিলের ট্রাঙ্ক একটা ওপর আর একটা। তার পেছনে পাউরুটির খালি ঠোঙ্গার ডাঁই। বাবা বলেন, যাকে রাখ সেই রাখে। ফেল না কিছু সবই কাজে লাগবে। আর এককোণে ছেঁড়া-বালিসের তুলো। একদিকের দেয়ালে বিশাল একটা দাঁড়া আলনা। কুলুঙ্গিতে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সিঁদুর মাখা ছবি। একটা প্রদীপ কেঁপে কেঁপে জ্বলছে।

ঘরে ঢুকেই বাবা বললেন ছি-ছি। অপরাধীর মত মুখ করে আলনা থেকে আমার লাল লেঙ্গটটা টেনে নিলুম। বাবা ততক্ষণে দাঁতে লুঙ্গি চেপে লেঙ্গট পরতে শুরু করেছেন। পেছন দিকে চওড়া পটিটা তখন লেজের মত দুলছে। ওটা ঘুরে সামনে চলে আসবে। লুঙ্গি পরে থাকার সুবিধে কাপড় না ছেড়েও লেঙ্গট পরা যায়। আমি পরে আছি প্যান্ট। বাবার দিকে পেছন করে ঠাকুরের দিকে মুখ করে প্যান্ট খুলে ফেললুম। ঈশ্বরের সামনে সহজেই অনাবৃত হওয়া যায়।

নাও, ডাম্বেল দুটো নামাও। ফিগার ওয়ান। ফিগার ওয়ান গত একমাস ধরে কিছুতেই পারফেকট হচ্ছেনা। একটা ডাম্বল দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে হাঁটু না ভেঙে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনে বেণ্ট হয়ে পায়ের পাতা ছুঁতে হবে। সামনে ঝুঁকলেই আমার হাঁটু দুটো ভেঙে যাচ্ছে, বোল্ড হয়ে যাওয়া উইকেটের মত? হাঁটুর এই অবাধ্যতা বাবা মনে করেন আমার অবাধ্যতা। মানুষ সন্ধিপদ প্রাণী। চারিদিকেই হাড়ের জোড়। এখানে গাঁট ওখানে গাঁট। গাঁটে গাঁটে শয়তানি থাকতে পারে, কিন্তু স্বাধীন গাঁটিকে নিজের ইচ্ছেতে সব সময় চালান যায় না। বাবা মনে করেন অন্যরকম, হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। বাবা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, ভাঙছে ভাঙছে। এমনভাবে ভাঙছে ভাঙছে বললেন যেন একটা বাড়ি কি নদীর ব্রিজ ভেঙে পড়ছে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে গেলুম। সামনেই অসন্তোষ ছেটানো বাবার দুঃখিত মুখ।

তোমার ইচ্ছেও নেই, একাগ্রতাও নেই। ইচ্ছে থাকলে কান পর্যন্ত নাড়ানো যায় আর একমাস হয়ে গেল হাঁটু না ভেঙে সামনে ঝুঁকতে পারছোনা। একেবারে গয়ংগচ্ছ ভাব, ঠিক ওই ওনার মত। শুয়ে থাকলেই যদি চলে যায় দাঁড়াবার আর দরকার কি?

দক্ষিণের ঘরের দিকে তাকিয়ে বাবা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে জলদ গম্ভীর গলায় বললেন, হায় প্রভু। আমি তখন আবার গোড়া থেকে শুরু করেছি। এবার যথেষ্ট। একাগ্র। মাথার যে জায়গায় ইচ্ছে থাকে সেইখানে থেকে ইচ্ছের স্রোত ভাঙা হাঁটুতে পাঠাবার চেষ্টা করছি। বাবা সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিচ্ছেন,

নাও নাও আর একটু, আর একটু, ঠিক হায় বহুত আচ্ছা বহুত............।

উৎসাহের আধিক্যে যেই একটু বেশি ঝুঁকেছি, হাঁটু ভাঙল না বটে, গোড়ালি দুটো উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারিয়ে টর্পেডোর মত কিম্বা একটা চার্জিং বুলের মত চোঁ করে বাবার তলপেটে একটা টুঁস। বহুত আচ্ছার আচ্ছাটা আর বেরোল না, বহুত কোঁক হয়ে গেল। পেছন দিকে টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে খুব সামলে নিলেন। আমি তখন আমার ইচ্ছা শক্তির কেরামতিতে বাবার পায়ের তলায় চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ, হামা দিয়ে বসে আছি। ইচ্ছে তখন পড়ে যাওয়া ঘড়ির মত বিকল, চলছে না। উঠে দাঁড়িয়ে বাবার মুখোমুখি হবার সাহস নেই।

বাবা বললেন, অপদার্থ! আর একটু হলেই আমার অ্যাবডোমেনটা ফেটে যেত। কোলনে এসে ডিরেকট চার্জ করেছ। নিজেও মরতে আমাকেও মারতে। সবশুদ্ধ ওই জাঙ্কইয়ার্ডে পড়লে আমার ডেথ ইয়ার্ড তৈরি হত।

বাবার পেছনেই ছিল সেই স্টিল ট্রাঙ্কের আড়ৎ। তার পেছনে রুটির খোলের মজবুত ভাণ্ডার। উঁচিয়ে আছে দুটো প্রমাণ সাইজের শাবল, বাবাব গার্ডেনিং টুলস। তার ওপর দেয়াল-তাকে নানারকম কেমিকেলস কেমিস্ট বাবার ল্যাবরেটরি। ওর মধ্যে আছে ছ'বোতল নানা ধরনের অ্যাসিড্, পিগমেন্ট, ডাইস্টাফ, গ্যালিক অ্যাসিড ট্যানিক অ্যাসিড।

উঠে পড়। ফ্রন্ট বেন্ডিং তোমার কম্ম নয়। বুঝে গেছি। হয় ক্রলিং না হয় স্ট্যান্ডিং-এর মাঝে তোমার আর কোন ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ নেই। এসব জিনিস হল সংসারের শালগ্রাম। যার ওঠাও নেই, বসাও নেই।

ডাম্বেল হাতে উঠে দাঁড়াতেই দরজার ওপাশ থেকে কানে এল—পারেক নাই পারেক নাই, ছোট মামাকে টুঁস মেরেছে বটেক? আর একটি কণ্ঠের প্রশ্ন কি করে বটেক? আর একটি কণ্ঠ লেগেছে বটেক? বটেকের স্রোত বইছে দরজার ওপাশে দক্ষিণে আমাদের বড় ঘরে। তার মানে পুবের দরজার পাশে ঘাপটি মেরে আমার পিসতুতো ভাই বোনেরা দেখছিল। এখন নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা খোলসা করে নিচ্ছে।

বাবার ভুরুর কাছটা একটু ভাঁজ হয়ে গেল। লুঙ্গির তলার দিকের কিছু অংশ ভাঁজ করে কোমরে গোঁজা। পায়ের গোছ দেখা যাচ্ছে। দেহের অন্য অংশের তুলনায় ফর্সা। মার্কিণের লুঙ্গি গেরুয়া রঙে রঙ করা। আদুর গা। গলার কাছে ছোট করে পৈতেটা হারের মত পরেছেন। দুম দুম করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পাল্লা দুটো ভেজান ছিল, একটানে খুলে ফেললেন। বাইরে ঝুলন্ত শিকল তাঁর অসন্তোষকে শব্দময় করে দিল। শরীরটাকে এদিকে রেখে গলাটাকে ওদিক বাড়িয়ে দিলেন—কি চাই তোমাদের? বটেকরা সব চুপ।- কিছু চাই তোমাদের, এনি থিং ইউ ওয়ান্ট? গলাটা টেনে নিলেন-আনডিজায়রেবল ডিসটারবেনস বিগিন।

শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডিসটারবেনস। পিসিমার ছোট মেয়ে প্যাঁ করে

কেঁদে উঠল। চটাস চটাস চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁটা বেশ খেলে উঠল। আর সেই সময় ঘুম জড়ানো চোখে মাতালের মত টলতে টলতে জ্যাঠাইমা পাখা হাতে আমাদের আখড়ায় এসে ঢুকলেন। তিনি পূবের দরজার দিকে আমাদের ঘর দিয়ে আপন মনে চলেছেন। যেতে যেতে বললেন ছেলেটাকে মারছ কেন? তোমার তো মারধোরের স্বভাব ছিল না। কটা বাজলো? কটা হল?

বুকে হাত মুড়ে বাবা বিবেকানন্দের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্যাঠাইমা পালতোলা নৌকোর মত ভেসে ভেসে চলে গেলেন। পিসিমার ছোট কন্যা তখন প্যাঁ ছেড়ে ভ্যাঁতে নেমেছে। বাবা কোণ থেকে মুগুর দুটো তুলে নিয়ে জোরে জোরে ভাজতে লাগলেন। একটা যখন এক হাতে মাথা উঁচিয়ে স্থির অন্যটা তখন মাথার ওপর দিয়ে একটা ফুলসার্কল করে বুকের কাছে নেমে এসে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মুগুরের পরে পা ফাঁক করে ডন হবে, তারপর হবে লাফা বৈঠক।

দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করল। লুঙ্গির ভাঁজ খুলে স্বাভাবিক হলেন। ছোট্ট ঘরেই গোল হয়ে কয়েকবার উত্তেজিত ভীমের মত হাঁটলেন। প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মন্থর পায়ে আলনার পাশে ঝোলান একটা ছাই রঙের কোটের পাশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মোড়ক বের করলেন। ব্যায়ামের পর বাবার মেজাজটা একটু নরম হয়ে আসে। বোধহয় বড় জ্যাঠামশায়ের কথা মনে পড়ে। বাবার ব্যায়াম গুরু।

কতবার যে ওই গল্প শুনেছি: তখন কলেজে পড়ি ভীষণ ডিসপেপসিয়া। জলের মত স্টুল। দিনে কুড়ি বার পঁচিশ বার। জল পর্যন্ত হজম হচ্ছে না। চেহারা একেবারে স্কেলিটন। বড়দা বললেন চলে আয়। নেমে এলুম নীচের কুস্তির আখড়ায়। পটাপট পটকে দিলেন বার কতক। তিনদিন পড়ে রইলুম বিছানায়। ফোর্থডেতে আবার। শেষকালে আড়াইশো ডন, পাঁচশো বৈঠকে উঠে ছিলুম। আর ওই যে সুপুরি গাছের তলায় যে বিশাল পাথরটা এখন মাটিতে পুঁতে আছে, ওইটা দ'ভায়ে গঙ্গা থেকে তুলে এনেছিলুম। দু'হাতে তুলতুম মাথার ওপর। ডিসপেপসিয়া ফ্রেড এওয়ে। চড় চড় করে চেহারা বেড়ে গেল। এক সময় বুকের ছাতি হয়েছিল আটচল্লিশ, এক্সপাণ্ডেড ছাপান্ন। তাইতো বলি একসারসাইজের কি গুণ। ফলতে বাধ্য। সর্দি নেই, কাশি নেই, জ্বর নেই, শিরঃপীড়া নেই। সব সময় মনে রাখবে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর। ডাক্তারের পেছনে, উকিলের পেছনে, ঘোড়ার পেছনে টাকা গুঁজে বহুপরিবার ফতুর হয়ে গেছে। আমাদের দশখানা বাড়ি হতে পারতো, রোগের পেছনেই সব গেছে। মোড়ক খুলে বাবা বললেন, হাত পাতো। হাতের তালুতে গুণে গুণে দশটা কিসমিস, পাঁচটা কাগজি বাদাম দিলেন। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে খাও। বাদাম যত চিবোবে তত উপকার। কসের দাঁতকে গ্রাইন্ডিং হুইলের মত ব্যবহার করবে, এ্যাঁই এ্যাঁই করে। তবেই বাদাম থেকে হাইড্রোসিয়্যানিক অ্যাসিড বেরুবে, এ পোটেনশিয়াল মেডিসিন ফর স্টম্যাক।

ওই কৌটটা হল বাবার ভান্ডার। বুক পকেটে লাউ, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়োস প্রভৃতির বীজ। ভেতরের পকেটে বোতাম, ছুঁচ, সুতো, পেরেক, স্ক্রু, পাশ পকেটে লজেনস, কিসমিস, বাদাম। দুপুরবেলা কৌটটার দিকে তাকিয়ে মেঝেতে চুপ করে বসে থাকি। যেন বেড়াল বসে আছে শিকের দিকে তাকিয়ে। মন, তখন দুটো হয়ে যেত। একটা মন বলত, চুপ করে বসে কেন, যা হাত ঢোকা একটা লজেনস মুখে পোর, গোটা কতক কিসমিস দু'আঙুলে রগড়ে রগড়ে বেশ তুলতুলে করে জিভ ফেলে দে। বেড়াল তপস্বী হয়ে লাভ কী ?

আর একটা মন বলত, খবরদার হাত দিয়েছ, কি রাতে মরেছ। হিসেবের কড়ি বাঘে খেলে কি হয় মালুম আছে তো? এক মাস কথা বন্ধ। ভবিষ্যতের পাওনা বন্ধ। ডোন্ট কিল দি গোল্ডেন গুজ। যা পাচ্ছ তাইতে সন্তুষ্ট থাক। মনে নেই তোমার শিক্ষা, ছেলেপুলে হবে ট্রেনড ডগের মত। পাহারা দেবে, থাবা মারবে না। ফোঁস ফোঁস করে একটু শুঁকে দেখতে পার, মালটা কি? হাতে করে না দিলে খুলবে না। কুকুর হল ভগবান। কি সেলফ কন্ট্রোল, তেমনি ফেথফুল অবজারভ্যান্ট তেমনি তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এতটুকু বেচাল পাবে না কখন। অবশ্য মানুষের পক্ষে কুকুর হওয়া সম্ভব নয়। শয়তানের আপেল খাওয়া মাল শয়তানীটা যাবে কোথায়? প্রমাণ করে দেখিয়ে দাও, তুমি একটা বাচ্চা 'গ্রেট ডেন'। মানুষ হবার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে ট্রেনিং এর গুণে একটি বিশ্বস্ত বিলিতি ধরনের নেড়ি।

দুটো মনে শেষকালে একটা আপোস হত। কি দরকার বাপু, ছেলেটাকে বিপদে ফেলে। লজেনসও মিষ্টি, হোমিওপ্যাথিক ওষুধও মিষ্টি। অতএব হোমিওপ্যাথিক গুলিই খাওয়া যাক। এক একটি শিশিতে অজস্র গুলি। বাবার বাকসে এ থেকে জেড পর্যন্ত যত ওষুধ আছে তার থেকে চারটে করে গুলি নিলেও কেউ ধরতে পারবে না। মিষ্টি মিষ্টি ঝাঁজ ঝাঁজ। 'অ্যালো' নাম লেখা শিশিটার ওষুধ গলে জমে গেছে, দেশলাই কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খানিকটা বের করে নিলেই হবে। সারা দুপুর খাই খাই। ঘোরাফেরা অ্যাকোনাইট ব্রাওনিয়া, সিনা, চায়না, ইপিকাক, থুজা মিলিয়ে মিশিয়ে খেয়ে যাও। মিল্ক সুগার খেওনা, ধরা পড়ে মরবে।

কটা বাজল? কটা বাজল? করতে করতে জ্যাঠাইমা বোধহয় উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। যখন দেখলেন কেউই কোন সদুত্তর দিতে পারছে না, কারণ বাড়িতে কোন দেয়াল ঘড়ি নেই, থাকার মধ্যে আছে, জ্যাঠামশায়ের একটা সোনার রিস্টওয়াচ আর বাবার একটা রুপোর পকেট ওয়াচ, দুটোই বাবার হেফাজতে, তখন বোধহয় রাতের আকাশ দেখে, বাতাসের উত্তাপ দেখে, সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করেছিলেন। কাজটা কঠিন। তখন তাঁর মনে হল আর একটু ঘুমিয়ে নি। রাত্রির কোন্ প্রহরে আছি বোঝা না গেলেও ভোরের সূর্য সময় বলবেই। অতএব সংশয়ের কালটা নিদ্রাকেই উৎসর্গ করে দি। নিদ্রারূপেন সফলতা জ্যাঠাইমা এখন রান্না ঘরের সামনে পূবের বারান্দায় চিৎপাত। অন্ধকারে তাঁর সাদা কাপড়

আর ফর্সা মুখের কিছুটা ভূত দেখার মত দেখা যাচ্ছে। একপাশের দেয়ালে গোটা কতক আরশোলা রাত্রিকালীন স্ফূর্তি উপভোগ করছে। পাশেই বাগানের ঝাঁকড়া গাছ, মাঝে মাঝে হাওয়ায় দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে বেশ শান্তির সংসার-আমার তিন পিসতুতো ভাই বোন খাবার ঘরের জানলায় বসে বটেক বটেক করছে। পিসিমা জল রাখার বিশাল জালাটায় হাত বুলোচ্ছেন আর মাঝে মাঝে শরীরের এখানে ওখানে চাঁটা মেরে মশা তাড়াচ্ছেন। একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। মনে হচ্ছে জগৎ যেন হঠাৎ থেমে গেছে। কিম্বা মাঝরাতের ক্ষুদে স্টেশান। যাত্রীরা বসে আছে শেষ রাতের ট্রেনের জন্যে।

স্লেট মোছা ন্যাকড়া ভেজাবার জন্যে বাড়ির ওই ভূতুড়ে দিকটায় গিয়েছিলুম। ব্যায়াম হয়েছে, নিউট্রিশান হয়েছে, স্তোত্রপাঠে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, এইবার হবে গর্দভ থেকে মনুষ্য হবার পেটাপিটি। রবিবার হলেও পড়ার ছুটি নেই। ন্যাকড়া ভেজান হয়ে গেছে। নিমগাছে জোনাকির আলো জ্বালানোর কসরত দেখছিলুম। বাবা এলেন সেই ঘুম স্টেশানে, লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে, স্টেশান মাস্টারের মত। প্ল্যাটফর্মের একপাশে এটা কি? আলোটা ফেললেন, ও তুমি? জ্যাঠাইমাকে দেখে নিলেন। খাবার ঘরের দিকে আলো ছুঁড়লেন জালার পাশে পিসিমা ও বটেকেরা সব চুপ। পিসিমার ছোট মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রহারের পর ক্রন্দন, ক্রন্দনের পর নিদ্রা। নিয়মের রাস্তাতেই গেছে।

ঠক করে লণ্ঠনটা রান্নাঘরে রেখে. দরজার কোণ থেকে বাবা প্রাইমাস স্টোভটা টেনে নিলেন। কখন কি করতে হয় সে ট্রেনিংটা বাবা আমার মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। যেমন, চা খেয়ে খালি কাপ টেবিলে রাখলেই সরিয়ে নিতে হয়। গা থেকে জামা খুললেই হ্যাঙার এগিয়ে দিতে হয়। বর্ষায়, ভিজে ছাতা আনলেই খুলে মেলে দিতে হয়। মেঝেতে ছাতাটা রেখে হাতল ধরে সিকের ওপর দিয়ে ভটঅ, ভটঅ করে ঘুরিয়ে একটু মজা করতে হয় এবং বকুনি খেতে হয়। খোলা বই দেখলে মুড়ে দিতে হয়। স্টোভ টানলেই স্পিরিটের শিশি এগিয়ে দিতে হয়।

স্পিরিটের শিশিটা বাবার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। বার্ণারের কার্নিসে একটু স্পিরিট ঢেলে দিলেন। এইবার চাই দেশলাই। নিদ্রিত উনুনের ঝিঁকের ভেতর দেশলাই থাকা উচিত। সেখানে নেই। পাশে শালপাতা আর ঠোঙার জঙ্গলে নেই। কয়লার গাদায় নেই। স্পিরিটটা সব উড়ে গেল। বাবা বললেন দিস ইজ বেঙ্গলী। অত সহজ নয়, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখব। যখনকার কাজ তখন করব।

এই সময়টা বাবার চা খাবার সময়। চা জ্যাঠাইমারই করার কথা। ইদানীং তাঁর কথায় আর কাজে মিল থাকছে না। বাবার পলিশি হল, নো ডিম্যান্ড। নো রিকোয়েস্ট। করলে, করলে, না করলে, না করলে। সেলফ হেলপ। কিন্তু প্রথমেই বাবা আটকে গেছেন। স্টোভে অগ্নিসংযোগই করা যাচ্ছে না। আসল জায়গাতেই সেলফ হেলপ আটকে গেছে। বেশ বিপর্যস্ত অবস্থা। প্রেসটিজ নিয়ে টানাটানি।

জালার পাশ থেকে পিসিমা উঠে এসে বললেন, কি খুঁজছো ছোড়দা?

স্টোভ ধরাবার জন্যে কি খোঁজে লোকে। পিসিমা যেন পরীক্ষার পড়া দিচ্ছেন চটপট সুর করে বললেন—শলাই।

শলাই নয় শশী, শলাই নয়, দেশলাই।

পিসিমা বীর বিক্রমে ঠোঙার গাদার মধ্যে হাত চালিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা আরশোলা ফরর করে উড়ে এল। আরশোলার ভয়ে আমি একটু নৃত্য করে ফেললাম। নৃত্যের বৃত্তটা একটু বড় হয়ে গিয়েছিল। চপল চরণপাতে স্পিরিটের শিশিটা শুয়ে পড়ল। ভাগ্যিস ছিপি আঁটা ছিল। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত বাবা লাফিয়ে উঠলেন—মাফ করো রাজা। চায়ে দরকার নেই। ওহে, আরশোলা তোমাকে মারতে পারবে না। পৃথিবীর কাউকে মারেনি। মারবে আগুন। পাশেই হ্যারিকেন। স্পিরিটের শিশিটা ভাঙলেই সব কটা আজ পুড়ে মরতুম।

দরজার পাশে বড় পিসতুতো বোন ভাইকে জিজ্ঞেস করল, কি বটেক?

ভাই বললে—আঁশুললা বটেক

বাবা বললেন—চুপ বটেক

পিসিমা বললেন—ঝ্যাঁটা পেটা করব বটেক।

জ্যাঠাইমা উঠে বসে বিড় বিড় করে বললেন, ভোর তো এখন হয়নি। এত আগে সব উঠলো কেন?

আজ মহালয়া নাকি?

পিসিমা বললেন, শলাই কোথায় মেজ বৌদি?

জ্যাঠাইমা আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, ভালই তো ভালই তো, ভাই-বোনে শলাপরামর্শ কর। আমার কি, আমার কি!

আমার পিসতুতো ভাই হঠাৎ বললে শলাই বটেক ছোট মামা?

বাবা বললেন, হ্যাঁরে গদাই।

গদাই অমনি ধাঁ করে ঘরে নিভু নিভু হ্যারিকেনের মাথা থেকে দেশলাইটা এনে মামার হাতে দিল। হাসি হাসি মুখ কলম্বাস যেন আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে, ফ্যার‍্যাডে যেন বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে। দেশলাইটা হাতে নিয়েই বাবা বললেন, গরম কেন? কোথায় ছিল?

আমি বললুম, ওই হ্যারিকেনটার মাথায়।

হ্যারিকেনের মাথায় দেশলাই। কার এই গরুর বুদ্ধি! মরার ইচ্ছে হয়েছে।

দিদির বটেক।

বড় বোন চাটি করে ভাইয়ের মাথায় চাঁটা মেরে বললে, দূর মাথা ফাটা, মিথ্যাবাদী।

ভাই বললে, হাঁদি।

বাবা স্টোভের কাছে উবু হয়ে বসে বললেন, শশী এদের একটু সিভিলাইজড

করতে হবে।

কালকেই করে দেব ছোড়দা তা না হলে ও উকুন মরবে না। কত ধরবো আর মারবো বটেক।

স্পিরিটের নীল শিখায় বাবার গম্ভীর মুখ। বার্ণারে আগুন ধরছে। সাঁ সাঁ আওয়াজ উঠছে।

পিসিমা কেটলি ধুয়ে জল মেপে এনেছেন। বাবা চাপাবার আগে কেটলিটা একবার আপাদমস্তক পরীক্ষা করে নিলেন। খুব সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন বলে মনে হল না। তবু চাপিয়ে দিলেন। কয়েকবার পাম্প করে তেজটা একটু বাড়িয়ে দিলেন।

চায়ের কৌটো আর কনডেনসড মিল্কের কৌটোটা সহজেই পাওয়া গেল পাওয়া গেল না চিনির শিশি। বাবা হলেন পারফেকশানের ভক্ত, চায়ের পাতা জলে পাঁচ মিনিট ভিজবে তো পাঁচ মিনিটই ভিজবে। বগলে থার্মোমিটার তিরিশ সেকেন্ড রাখতে হবে তো তিরিশ সেকেন্ডই থাকবে, চা ভিজছে। বাবা পিসিমাকে বললেন, একবার জিজ্ঞেস কর। শেষ হার্ডলে চা পর্ব বুঝি আটকে যায়। পিসিমা এগিয়ে গেলেন, মেজ বৌদি ও মেজবৌদি।

জ্যাঠাইমা ঘুম জড়ান গলায় বললেন, দরজাটা খুলে দাও না।

পিসিমা বললেন, দরজা খোলাই আছে, ছোড়দার চা হবে চিনির শিশি কোথায়? চিনির শিশি?

জ্যাঠাইমা ধড়মড় করে উঠে বসেই হাতের তালু দিয়ে নাকটা বার কতক ঘষে বীভৎস একটা আওয়াজ বের করলেন। বাবা বললেন পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয় চিনি ছাড়াই চা হবে। জ্যাঠাইমা ততক্ষণে স্থান কাল পাত্রের জগতে ফিরে এসেছেন। উঠে দাঁড়াতেও পেরেছেন। ইদানীং বেশভূষার দিকে তাঁর নজরই থাকে না। গায়ে ব্লাউজ নেই। পরনের কাপড়টাও ময়লা। স্নানও বোধহয় রোজ করেন না। জল সহ্য হয় না।

জ্যাঠাইমা বাবার কাছাকাছি এসে বললেন, সরো সরো খুব হয়েছে।

বাবা সরার পাত্র নন। বাবা বললেন, না না তুমি বিশ্রাম কর, ঘুমোও ঘুমোও। ঘুমিয়ে মোক্ষ লাভ কর।

তুমি তো সব সময় আমাকে ঘুমোতেই দেখছ।

আচ্ছা আচ্ছা ঘুমোওনি, ঘুমোওনি।

চা তো ভেজালে তোমার চিনি কোথায়?

জ্যাঠাইমা এই বার চিনির প্যাঁচ মারলেন।

সে-এ-কি! বাবা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, এর মধ্যে চিনি শেষ।

আধসের চিনি তোমার কদিন চলবে? চায়ের যা ধুম।

আমার হিসেব আছে বৌদি। আধ সেরে ক চামচে হয় আমার মাপা আছে। তোমরা সংসার করছ জান না, আমি কিন্তু জানি। পার কাপ এক চামচে লাগলে

কত কাপ চা হয়?

কবে চিনি এসেছে ডেট দিয়ে আমার খাতায় লেখা আছে।

তোমার হিসেব তুমি কর তোমার চামচে মাপের জীবনে এখন বোন এসে গেছেন। যত পার হিসেব কর আমি হিসেবের বাইরে। জন্ম পর্যন্ত এইভাবে সংসার করিনি, করতেও পারব না।

বহুত আচ্ছা এই তো চাই, এইটাই শুনতে চেয়েছিলুম স্পষ্টাস্পষ্টি।

ধাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন, আমরা সব থমকে দাঁড়িয়ে আছি। নেকসট মুভটা কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময় প্রভাত কাকা সামনে এসে দাঁড়ালেন হাতে ঝুলছে দড়িটড়ি বাঁধা বিশাল একটা হাঁড়ি। মিষ্টির হাঁড়ি। প্রভাত কাকা বললে আমি প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছি। আমার হাতেই রয়েছে চিনি। ক্ষীর মোহনের রস এক চামচে দিয়ে দিন তো দিদি।

পিসিমা হাঁড়িটা নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলেন। বাবা রুদ্রমুর্তিতে বললে খবরদার। বোম ফাটলে যেমন বাতাসের ধাক্কা লাগে, আমরা সব কটা প্রাণী খবরদারের ধাককায় স্থাণুর মত হয়ে গেলাম। পিসিমার হাত ফিরে গেল। প্রভাত কাকার হাঁড়ি হাতেই রইল।

বাবা এইবার খরবদারটাকে অ্যামপ্লিফাই করলেন, তোমার বিলাসী জীবন তোমার ক্ষীরমোহন চাই, রাবড়ি চাই, ঘি চাই, মাখন চাই, দুধ চাই, দই চাই। আমরা কষ্টের পরীক্ষা দিচ্ছি, আমাদের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দাও। আমাদের অভ্যেসটাকে আর খারাপ করে দিও না। প্লিজ প্রভাত, প্লিজ। বাবার মুখটা কুঁচকে মুচকে কিরকম বিশ্রী হয়ে গেল।

জ্যাঠাইমা বললেন, প্রভাত ঠাকুরপো অনেক কষ্ট করেছি আর কষ্টমষ্ট করতে পারব না বাপু হাঁড়িটা আমার হাতে দাও, কেউ না খাক, আমি কয়েকটা খেয়ে দেখি।

বাবা পিসিমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তুই পারবি না শশী আমাদের সঙ্গে কষ্ট করতে, পারবি না বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করতে, পারবি না, লোভ লালসা ত্যাগ করে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হতে?

খুব পারব ছোড়দা, সেখানে একবেলা জুটতো, এখানে তো তবু দুবেলা জুটছে।

এই তো চাই একেই বলে স্পিরিট, একেই বলে সাক্রিফাইস, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

দাও ঠাকুরপো হাঁড়িটা দাও।

জ্যাঠাইমা লোভের হাত বাড়ালেন। প্রভাত কাকা কিন্তু হাঁড়িটা দিলেন না। তাঁর মুখ দেখে মনেই হল না— কোন কথাই গায়ে মেখেছেন। জ্যাঠাইমার হাত প্রায় হাঁড়ি স্পর্শ করে ফেলেছে। প্রভাত কাকা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন স্যাংচুমারি খ্যাং খেলি, গোয়িং টু পাতাল গুড়ু।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে প্রভাত কাকা হাত বাড়িয়ে হাঁড়িটা নিচের উঠোনে ফেলে দিলেন। আমি চোখ বুজিয়ে ফেললাম, ভটাস করে একটা শব্দ হল। আমার পিসতুতো ভাই গদাই ফেলে দিলে বটেক বলে, স্টোভ-ফোভ্ কেটলি-ফেটলি টপকে দৌড়ে বারান্দার দিকে আসছিল, প্রভাত কাকা একটা পা সামনে একটা পা পেছনে রেখে বুকটা চিতিয়ে বললেন, খবরদার। না বুঝে এনেছি মিষ্টি দিয়েছি ফেলে নিচে, স্যাংচুমারি রে, লক্কা লাখ ফক্কা ফাঁক, চিচিং ফাঁক।

একটা পায়ের উপর ভর দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় প্রভাত কাকা ফরর করে ঘুরে গেলেন। লম্বা কোঁচা লটপট করে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। ভ্রুক্ষেপ নেই। সেই অবস্থাতেই, ওরে বাবা কি গরম রে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা বলতে বলতে ডিঙ্গি মেরে মেরে বড় ঘরের দিকে চললেন।

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞেস করলেন, ক'টাকার ছিল প্রভাত।

বেশি না, দশ টাকার।

তখনকার দিনে দশ টাকার মিষ্টি মানে অনেক মিষ্টি। জ্যাঠাইমা প্রায় আঁতকে উঠলেন, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিস কি? আলোটা নিয়ে নিচে দৌড়ো, যে কটা পারিস তুলে নিয়ে আয়। ওদের মাথা খারাপ বলে আমরা তো আর পাগল নই, চল আমিও যাচ্ছি।

গদাই বললে, মাইমা মন্ডা বটেক?

হ্যাঁরে হলদে হলদে বড় বড় মন্ডা।

গদাই প্রায় ছুটছিল। বাবা বললেন ছি ছি এটা কি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, নর্দমা থেকে মিষ্টি তুলে খেতে হবে। যে খায় খাক, গদাই তুই খাবি না, উৎপাতের ধন চিৎপাতে গেছে বেশ হয়েছে।

গদাই কিছুটা মনমরা হয়ে খাবার ঘরের দরজার চৌকাঠে থেবড়ে বসে পড়ল। জ্যাঠাইমার দলে কেউ নেই। বাবা সংখ্যা গরিষ্ঠের বলে বলীয়ান। জ্যাঠাইমা তবু হারলেন না। তাঁর তখন রোখ চেপে গেছে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে তোরা তোদের অন্নদাতার ধামা ধরে থাক, আমি কারুর পরোয়া করি না আমি একাই যাব, একাই তুলবো, একাই খাব।

বাবা বিকৃত গলায় বললেন, যাও না, যাও না কে তোমাকে আটকাচ্ছে। পিশাচ সিদ্ধের পক্ষে সবই সম্ভব।

মাসে একদিন চান, যেখানে সেখানে পড়ে ঘুমনো। নির্গাডিলি উওম্যান।

বাবা খড় খড় করে চলে যাচ্ছিলেন। জ্যাঠাইমা সুর করে বললেন, ও আমি এখন পিশাচ? এক সময় একেই তো অপ্সরী বলে তুলে এনেছিলে আধবুড়ো ভায়ের বড়শি ফেলে। বাবা ঠিকই বলতেন, ভ্রুকুটি কুটিল ভারি, বন্দ্যো কাটি সাদা। সবার মাঝে বসে আছে চট্টো হারামজাদা. ওরে বাববা চট্টো হারামজাদা।

শেষের লাইনটা জ্যাঠাইমা গানের মত সুর করে বারে বারে রিপিট করলেন।

বাবার অপমানিত, রাগত, গম্ভীর মুখে কোনো কথা নেই। বাবার অপমান যেন নিজেরও অপমান। জ্যাঠাইমা যে কত নিষ্ঠুর তা জানতুম, কতটা অসভ্য সেই দিনই বুঝলুম। পাতলা নাক, পাতলা ঠোঁট, পাতলা চোখের দৃষ্টিতেই তাঁর নিষ্ঠুরতা ধরা আছে। নিষ্ঠুরতার দুটো ঘটনা আজো মনে আছে। মনে থাকবে চিরকাল। জ্যাঠামশায়ের অসুখের সময় জিওল মাছ এসেছে। ডাক্তার বলেছেন স্টু করে দিতে। জ্যাঠাইমার কায়দা শুরু হল। মাছটাকে মেঝেতে ফেলে এক খাবলা নুন দিয়ে দিলেন। মাছটা যন্ত্রাণায় ছটফট করতে করতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে খানিকটা লালা মত বেরিয়ে গেল। জ্যাঠাইমা তখন বঁটি দিয়ে দাঁড়া বা শুড়গুলো কেটে ফেললেন। সেগুলো মাটিতে পড়ে থির থির করে কাঁপতে লাগল। মাছটার পেট থেকে বুক পর্যন্ত যন্ত্রনার একটা ঢেউ খেলে গেল। মুখ দিয়ে চিঁ চিঁ করে শব্দ করে উঠলো। সেই প্রথম দেখলুম মাছের মৃত্যুর আর্তনাদ। জ্যাঠাইমা নির্বিকার। পেট চিরে পিত্তি টিত্তি ফেলে দিলেন। মাছটা তখন সম্পূর্ণ মরেনি। উঁচু বাড়ির ছাদে শেষ বেলার রোদ লেগে থাকার মত তার গায়ে জীবন তখন লেগেছিল। গরম তেলে আস্ত মাছটাকে যখন ফেললেন সেটা কিলবিল করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। মাছটাকে ফের কড়ায় ফেলে খুন্তি দিয়ে চেপে ধরে রইলেন যতক্ষণ না জীবনের শেষ নির্যাসটুকু তেলে মিশে গেল।

আর একদিন আমাদের খাবার সময় আমার পোষা বেড়াল মঙ্গলা জ্যাঠাইমার পাতের কাছে মাছের বায়না করছিল। জ্যাঠাইমা বাঁ হাত দিয়ে বেড়ালের মুখটা মেঝেতে জোরে ঠুকে দিলেন। মঙ্গলা যখন মুখ তুললো তখন তার মাছ খাবার লোভ চলে গেছে। এতটুকু নরম নাকটা আরো থেবড়ে গেছে। মেঝেতে টপটপ করে রক্ত ঝড়ে পড়ছে। চিটচিটে লাল রক্তের ফোঁটা ফেলতে ফেলতে লোভী বেড়ালটা সেই যে চলে গেল আর ফিরে এল না। আমরা কেউ আর সেদিন খেতে পারলুম না। জ্যাঠাইমা কিন্তু পাতের সামনে দগদগে সেই রক্তের ফোঁটা রেখে অম্লান বদনে হুসহাস করে ভেটকি মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে গেলেন।

মাননীয় মানুষের অপমান সহ্য করা যায় না। বাবার বিব্রত অসহায় মুখ। তিনি যেন সাময়িকভাবে চুপসে গেলেন। ছোটদের সামনে তাঁকে এইভাবে আঘাত করা উচিত হয়নি। বাবার হাত ধরে বললুম, চলুন, আমরা পড়ার ঘরে যাই। বাবা যেন বহু দূর থেকে বললেন, তাই চলো। সেই মুহূর্তে সংসার আবর্ত থেকে আমরা দু'জন যেন পৃথক হয়ে গেলুম। শাসক আর শাসিতদের মধ্যে অদৃশ্য একটা পাঁচিল উঠে গেল। বোঝা পড়ার দিন শেষ।

পড়ার ঘরের টেবিলে এসে বসলেন। বারে বারে একটু একটু চা খেতে ভালবাসেন। অনেক আশার মুখের চা, চিনি শূন্য তিক্ততায় কেয়ার অফ নান হয়ে রান্না ঘরে পড়ে রইল। সাধ্য আর সামর্থ্য থাকলে এক চামচে চিনি মিশিয়ে এককাপ চা বাবাকে এই মুহূর্তে এনে দিতুম। কিন্তু ইচ্ছে প্রবল হলেও উপায় নেই। রাম

থেকে ভূত যত দূরে, চিনি থেকে আমি তার চে বেশি দূরে। চিনির বেহিসেবী খরচ সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তা'হল জ্যাঠাইমার সরবত প্রীতি। ঢাল চিনি, মার জল, ফেল গলায়। আঃ পেট ঠান্ডা। ভুঁড়ির সঙ্গে মুড়ির যোগ। তারপরই ভূমি শয্যায় অসুখীর সুখনিদ্রা!

হাতের সামনে, টেবিলের ওপর পড়েছিল ঈশপস ফেবলস। পাতা উল্টে উল্টে বাবা একটা জায়গায় এসে থেমে পড়লেন। কিছুটা অন্যমনস্ক। উল্টো দিকে বসে, আমার চোখে পড়ছে, রঙীন ছবি, সুন্দর, বড় বড় ইংরেজী হরফ। চকচকে পাতা। বইটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, গল্পটা গুছিয়ে বল ঃ

বাইরে শীতের রাত। বাতাসে হিমের কামড়। তুষারের কম্বলের তলায় প্রকৃতি কাঁপছে। একটা ছোট্ট কুটিরের জানলায় ফ্যাকাসে হলুদ আলো। আশ্রয়হীন একটি উট শীতে কাঁপতে কাঁপতে কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল। একটু আশ্রয় চাই। জানলার কাঁচে নাকটা ঠেকাল। নিশ্বাসের বাষ্প জমে গেল কাঁচে। গৃহস্বামী জানলা খুলে জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই!

শীতে জমে যাচ্ছি। একটু আশ্রয়।

এখানে জায়গা কোথায়। এই এতটুকু ঘর।

.একটু দয়া। এই হিহি শীতের রাতে বাইরে থাকলে আমার যে মৃত্যু হবে। সকালে উঠে দেখবে দরজার বাইরে আমার হিম মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন কিন্তু তোমার দুঃখ হবে।

কিন্তু এখানে তুমি থাকবে কি করে।

আচ্ছা বেশ। তবে একটা রফা হোক। শীতে আমার নাকটাই বড় কষ্ট পাচ্ছে। জান তো, যত শীত সব নাকে।

তুমি যেমন আছ থাক, আমাকে শুধু নাকটা একটু ভেতরে রাখতে দাও।

বেশ তাই রাখ!

নাক থেকে মাথা, মাথা থেকে গলা, গলা থেকে কাঁধ, কাঁধ থেকে ক্রমে ক্রমে সারা শরীরটাই ভেতরে চলে এল। গৃহস্বামী বললেন, এটা কি হল? এবার আমি কোথায় যাব?

অমায়িক হেসে উট বললে, হে আমার উপকারী আশ্রয়দাতা, তোমার যদি খুব অসুবিধে হয় তাহলে তুমি বরং বাইরে চলে যাও। এর বেশি আমি আর কি করতে পারি!

বাবা গুম হয়ে কিছুক্ষণ জানলার ল্যাপ্টানো অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ছোট্ট নস্যির ডিবেটা অন্যমনস্ক ভাবে টেনে নিলেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, এই হল জগৎ! বুঝেছ। এই হল তোমার জগৎ। উটের সংসার! গিভ দেম এন ইঞ্চ, দে উইল আস্ক ফর অ্যান এল। যেই এক ইঞ্চি দেবে, সঙ্গে সঙ্গে এক বিঘত চাইবে,

তারপরই এক হাত। নিবৃত্তি নেই। আরো চাই, আরো চাই, আরো, আরো, আরোও।

উত্তেজনাটা আবার ফিরে আসছে। ফোঁ করে নস্যি নিলেন। এক টিপে হল না। আর এক টিপ আঙুলে ধরা। সেই টিপ ধরা আঙুল দুটো নেড়ে-নেড়ে বললেন, বিশ্ব জুড়ে অনাহত ওংকারধ্বনি নয়, দেহি, দেহি, দেহি রব উঠছে। সেই গানটা, তোর মামার সেই গানটা মনে পড়ে—"ভিখারি বাসনা করি হইতে চায় লক্ষপতি, লক্ষপতি হলেও সে হইতে চায় কোটিপতি, ইন্দ্রত্বও লভিলে সে শিবত্ব করে কামনা"। সন্তুষ্টি নেই। কোথায় সেই কন্টেন্টমেন্ট। লেলিহান লোভ দাউ দাউ করে জ্বলছে। হায় মানুষ, হায় মানুষ, হায় হায় হায়!

হায়, হায় উচ্চারনের নিশ্বাসের ধাককায় কিনা জানিনা, আলোটা হঠাৎ আলেয়ার মত দপ দপ করে লাফাতে শুরু করল। বাবা বললেন—কমাও, কমাও। পলতে কমাবার কলটা আমার দিকে ছিল। তাড়া-তাড়িতে কমাতে গিয়ে তেড়ে বাড়িয়ে ফেললুম। আলোটা ভপ করে লাফিয়ে উঠে নিভে গেল। কেরোসিনের ঝাঁজালো ধোঁয়ায় গলা বুজে আসছে। নাকে নস্যির রুমাল চেপে ধরে বাবা বললেন—পালাও, পালাও। জানালার ধারে উঠে গিয়ে মুক্ত বাতাসের দিকে নাকের ফুটো দুটো জলে দিলুম। বাবা শব্দ করে চেয়ারটা পেছিয়ে নিলেন। পেছনে এক গাদা জুতো ছিল। চেয়ারের একটা পায়া একপাটি জুতোর ওপর উঠে পড়েছে। চেয়ারটায় বসতেই চকচক করে উঠল। ব্যাপারটা বোঝার জন্যে আরো বেশ কয়েকবার সামনে পেছনে দোল খেলেন। যেন কাঠের ঘোড়া। চেয়ারটাকে আবার একবার সামনে টেনে নিলেন। এবারেও সেই চকচক। পেছনে ঠেললেন। অবস্থায় কোন উন্নতি হল না। তখন নিচু হয়ে অন্ধকারেই পর্যবেক্ষণঃ

—আই সি! তুমি জুতো পরে বসে আছ। তাই বলি। এটা কার জুতো?

জানালার কাছ থেকে সরে এলুম অপরাধী জুতোর সনাক্তীকরণের জন্যে। চেয়ারের একটা পায়ায় ঝকঝকে একপাটি কালো নিউকাট ভয়ে ভয়ে বললুম—প্রভাত কাকা।

—প্রভাতের জুতো!

ভাগ্যিস আমার জুতো নয়। জুতো রাখার জন্যে একটা র‍্যাক আছে। সমস্ত জুতো র‍্যাকে সাজিয়ে রাখাই নিয়ম।

—ওটা কার?

পাশেই এক জোড়া ক্ষয়া ক্ষয়া স্লিপার। বাবার লক্ষ্য এবার সেটার দিকে।

—ওটা জ্যাঠাইমার।

উঠে দাঁড়ালেন। একপায়ে জুতো পরা চেয়ারটার দিকে মিনিটখানেক চিন্তিত মুখে চেয়ে থেকে বললেন,

—ঠিক আছে। তবে তাই হোক। এদিকে এস।

এসেই তো আছি। আর কতটা আসব। এখন নতুন নির্দেশের অপেক্ষা।

—লাগাও।

কি লাগাতে বলছেন? প্রশ্ন করারও সাহস নেই।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকোনা। একটু চটপটে হবার চেষ্টা কর। ভুলে যেও না তুমি বাঙালী। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত প্রাণী। জান তো, হিটলার যুদ্ধের সময় একজন বাঙালীকে চিড়িয়াখানায় খাঁচায় ভরে রেখেছিল, প্রদর্শনী হিসেবে। তথ্যটা জানা ছিল না, বাবার মুখে শুনে বেশ মজা লাগল। মজা লাগলে তো চলবে না, এখন নির্দেশ অনুসারে লাগাতে হবে।

—কি লাগাব বাবা?

—জুতো লাগাও জুতো। চারপায়ে চারটে নিউকাট। আমারটাও নিয়ে এস। ভেবনা ভাবনার কিছু নেই, যস্মিন দেশে যদাচার। আর ওনার ওই চটি, দু'পাটি একসঙ্গে করে মাথার বালিসের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে এস।

জিনিসটা মন্দ হতনা। জুতো পরা চেয়ার, বালিস চাপা চটি। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ রান্নাঘরে হুড়মুড় করে একটা ভীষণ শব্দ হল। বাবা চমকে উঠলেন - যাও, যাও দেখে এস কে মরল। তোমার প্রভাত কাকাকে বল হসপিট্যালে নিয়ে যেতে।

পিসিমারা আসার আগে আমাদের পোড় বাড়ির এই উত্তর মহলে অন্ধকারে একা আসতে বেশ সাহসের দরকার হত। উত্তর আর দক্ষিণ মহল একটা ঝুল-বারান্দা দিয়ে যোগ করা ছিল। বাঁ দিকে তিন হাত ব্যবধানে দুটো সিঁড়ি। একটা দু'বার মোচড় খেয়ে ঘোর, ঘনঅন্ধকার স্যাঁত স্যাঁতে একতলায় গিয়ে নেমেছে। আর দ্বিতীয় সিড়িঁটা দু'বার বাঁক খেয়ে উঠে গেছে ওপরে ন্যাড়াছাদে। এই দুটো জায়গাই মারাত্মক ভয়ের। সবসময় মনে হয় নিচে থেকে কেউ উঠে আসছে, না হয় ওপর থেকে কেউ নেমে আসছে। এখন আর ততটা ভয় নেই।

রান্না ঘরের সামনের বারান্দা জল থৈথৈ করছে, সেই জলেই লাইট হাউসের মত মিটমিটে একটা হ্যারিকেন। জলের বন্যাটা জ্যাঠাইমার দিকেই বেশি। তিনি যেমন ঘুমোচ্ছিলেন তেমনিই ঘুমোচ্ছেন। বিশাল জালাটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পিসিমা ছোট মেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছেন। প্রভাতকাকা বোধহয় ছাদে ছিলেন, আমার মতই শব্দ শুনে সবে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই বললেন—নাও ধর। সুর করে গেয়ে উঠলেন—"বন্যা আয় সব গিয়েছে মা ভেসে...........

ভুলেই গিয়েছিলুম, বাবা ওদিকে অন্ধকারে বসে আছেন খবরের জন্যে। এদিককার মজা এত জোর জমেছে সব কিছু খেয়াল রাখাই মুশকিল। জ্যাঠাইমাকে জল থেকে জাগাবার চেষ্টা চলেছে। ঘুমন্ত হাত থেকে খসে-পড়া পাখাটা ভাসতে ভাসতে কিছু দূরে বাটনাবাটা শিলের কাছে আটকে গেছে। শিলটা আবার দেয়ালে এমনভাবে খাড়া করা, কোনভাবে একটু হাত লাগলেই উল্টে পড়বে। উনুনের কাছে কাঠের পিঁড়েটা ছিল, সেটাও বেশ ভেসে উঠে অল্প অল্প দুলছে, কোন্দিকে

যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

পিসিমা ডাকছেন, বৌদি ওঠো ওঠো, জলে সব ভিজে গেল।

প্রভাতকাকা ডাকছেন, বৌদি উঠুন উঠুন, ভিজে গেলেন যে।

ডাকাডাকি শুনে বাবা ভেবেছেন—বারান্দার ওই অংশটা যেসব কড়ি-বরগার ওপর ঝুলছে, সেগুলো ঘুণ ধরে গেছে। জ্যাঠাইমা শুয়েছিলেন ওই অংশটাতেই, সব সুদ্ধু হয়তো ভেঙে নিচেই পড়ে গেছেন। বাবা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করছেন—কি হল, প্রভাত, ও প্রভাত।

—ডেকে কিছু হবে না, নাকের কাছে হাত দিয়ে দ্যাখ বেঁচে আছে না, মরে গেছে।

বাবা যাতে শুনতে পান এইরকম গলায় আমি জানালুম, বেঁচেই আছেন, ঘুমোচ্ছেন।

—তাহলে ডাকাডাকি করে জাগাচ্ছ কেন? বেশ তো আছে, শান্তিতে আছে, থাক না। শব্দটা কিসের হল!

প্রভাত কাকা এবার উত্তর দিলেন—জালা উল্টে গেছে ছোড়দা। বন্যায় সব গিয়েছে মা ভেসে—

—এটা আনন্দের সময় নয় প্রভাত। এই সেদিন জালাটাকে সিমেন্ট দিয়ে আমি রিপেয়ার করেছি। ওর বয়স হল মোর দ্যান টেন ইয়ারস। কে এই উপকারটি করলেন।

পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলুম, বাবা নিজেই বন্যাঞ্চল পরিদর্শনে আসছেন। পিসিমা চাপা গলায় কোলের মেয়েকে বললেন—শত্তুর সব, শত্তুর, দোব গলায় পা তুলে শেষ করে।

যতটা সম্ভব আশেপাশে সরে গিয়ে, বাবাকে পথ করে দেওয়া হল। ডাকাডাকির চোটে জ্যাঠাইমা সবে উঠে বসেছেন, বসেই বললেন—বাঃ বেশ ভাল বৃষ্টি হয়েছে। কখন হল প্রভাত ঠাকুরপো!

উত্তর প্রভাত কাকা দিলেন না, দিলেন বাবা—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল বৃষ্টি হয়েছে, তুমি এখন সরে পড়।

জ্যাঠাইমা কি একটা খুঁজছেন-আমার পাখাটা, পাখাটা।

বাবা তাড়াতাড়ি বললেন—পাখাটা, পাখাটা, হাতে ধরিয়ে দাও, এক্ষুনি ধরিয়ে দাও, প্রাণবায়ু তা না হলে বেরিয়ে যাবে।

বাবাকে ঠেলে সামনে এগোতে পারছি না। সরু বারান্দা। একপাশে, খোলা দিকটায় কাঠের ফাঁক ফাঁক রেলিং। জায়গায় জায়গায় টুকরো কাঠের জোড়। বাবার হাতের কাজ। কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে। পেছন থেকেই বললুম — পাখাটা ওই যে শিলের কাছে। জ্যাঠাইমা পাখাটা ধরে টানতেই, শিল আর দেওয়ালের মাঝের নোড়াটা নড়ে উঠল। বাবা হৈ হৈ করে উঠলেন—গেল গেল,

শিলটা এইবার গেল।

ভিজে হাতপাখাটা নাড়তে নাড়তে, জ্যাঠাইমা বললেন—তোমার সবেতেই গেল গেল। যাবেও না, থাকবেও না, কি বল প্রভাত ঠাকুর পো।

প্রভাত ঠাকুরপো, আর কি বলবেন, তার আগেই হ্যারিকেনের পরিষ্কার চিমনিটা চি ফ্যাট করে ফেটে গেল। জ্যাঠাইমার পাখায় প্রচুর জল ছিল। পাখা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ছিটকে এসে গরম কাঁচে লেগেছে। এবার বাবা আর হৈ হৈ করলেন না, খুব চাপাগলায় বললেন—ভালগার! তারপর আলোটা হাতে তুলেই বুঝলেন, একটু আগে জালার জলে অবগাহনও করেচে। নিজের মনেই বললেন—সব যাবে। বাতি আর জ্বলবেনা এ বাড়িতে। জার্মানির ইফার আলো। এসব আর পাওয়া যাবে! আলোটাকে সিঁড়ির ধাপে রাখতে কি হয়। হাতে সব পক্ষাঘাত হয়েছে, না বুদ্ধি-সুদ্ধি সব গরুর মত হয়ে গেছে!

সিঁড়ির ধাপে আলোটা রাখতেই ফাটা কাঁচের একটা টুকরো ফুস করে মেঝেতে খুলে পড়ে গেল। ছোট্ট মত একটা গর্ত দিয়ে প্রচুর হাওয়া ঢুকে আলোটা কাঁপছে। বাবা প্রভাত কাকাকে বললেন, উনিও গেলেন, ইনিও গেলেন, এখন কি করবে দেখ।

প্রভাত কাকা কাঁচের টুকরোটা তুলতে যাচ্ছিলেন, বাবা উঁহু উঁহু করে উঠলেন—হাতটা পুড়বে প্রভাত।

—কিচ্ছু হবে না ছোড়দা। প্রভাত কাকা কাঁচটা তুলে ফুটোর জায়গায় মাপে মাপে বসিয়ে, টিপে দিলেন। হাওয়া লেগে আলোর কাঁপুনিটা তখনকার মত বন্ধ হল।

বাবা খুব খুশি - বাঃ বেশ লাগালে তো। একেই বলে পুরুষ আর মেয়েছেলে। কত তফাৎ! অ্যাঁ কত তফাৎ। পৃথিবীটা পুরুষ শূন্য হলে, কি অবস্থা হত প্রভাত।

প্রভাত কাকা একটু চিন্তা করে বললেন - তাহলে কোন মিষ্টির দোকান আর সেকরার দোকান থাকত না, বড় বড় রাজভোগ, ল্যাংচা, স্পঞ্জ রসগোল্লা।

—ঠিক ঠিক বলেছ। বড় বড় হালুইকর - পুরুষ, বড় বড় মিষ্টিওয়ালা - পুরুষ ভীমনাগ, নবীন ময়রা, রামলাল, দ্বারিক। দ্বারিকের ছোলার ডাল, অ্যামেরিকা থেকে এসে চেটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে। ওদিকে এম বি সরকার, পি সি চন্দ্র। করুক দেখি তোমাদের মেয়েরা। সব দাঁত ছিরকুটে পড়বে। এমন কি আমাদের গবা। কই করতো দেখি বাবা গবার মত ফুলুরি, আলুর চপ। করতো দেখি মূলচাঁদের মত হালুয়া।

জ্যাঠাইমা একটু সুর করে ঘুম জড়ান গলায় বললেন কেন তোমার বামুনদি কি হল। এই তো বলতে বামুনদির হাতে যা পড়বে তাই খুলে যাবে! বামুনদি মেয়ে না ছেলে! কি বল ঠাকুর পো?

বাবা মোটেই দমলেন না, বললেন — ওসব হল ব্যতিক্রম। সর্বগুণের বৌদি

নিজে হাতে করে শিখিয়ে গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে নিজের চেষ্টা। সে তো শেকসপিয়ারে একজন মহিলা আইনজীবীর উল্লেখ আছে। তা বলে মেয়েছেলে সি আর দাশ হবে, না বিধান রায় হবে?

জ্যাঠাইমার পাখা সমানে চলছে, বসে আছেন জলে সেই ঘুম জড়ান গলাতেই বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল সকালে একটু সরষে বেটে দিও তো শিলে। দেখব সব হিম্মত কত!

বাবা আর কথা বাড়ালেন না। রাত বেড়ে যাচ্ছে। থানার পেটা ঘড়িতে এই মাত্র দশটা বাজল। অবশ্য দশটার রাত বাবার কাছে কিছুই নয়। প্রভাতকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন—জালাটা গেছে তো! আবার দশটাকার ধাককা।

জালাটা একটা কোণে দুটো ইটের ওপর বসানো ছিল। আমার ছোট পিসতুতো বোন, ঘুমের ঘোরে দেয়ালের বাইরের দিকের ইটটা পা দিয়ে সরিয়ে দিতেই, জালা কাত। প্রভাত কাকা জালাটা সোজা করে ইটের ওপর বসিয়েছেন। এমনি তো মনে হচ্ছে কিছু হয়নি। তবে ফেটে গেছে কি না কে জানে! প্রভাত কাকা একটা লোহার শিক তুলে নিয়ে জালাটার শব্দ পরীক্ষা করলেন। টাং টাং করে শব্দ হল।

শব্দ শুনে বাবা বললেন—মনে হচ্ছে বেঁচে গেছে। থাক থাক, ছেড়ে দাও, আর বাজিও না। এখন জলের কি করবে দেখ। এতক্ষণে জ্যাঠাইমার খেয়াল হল—কি হয়েছে প্রভাত ঠাকুর পো!

—জালা উল্টে গেছে বৌদি!

—সে কি? কাল সকালে রান্নার জলের কি হবে। বদ্যিনাথ তো একদিন অন্তর জল দেয়। আজ দিয়েছে, কাল তো আর দেবে না। কে ওল্টালে। ঠাকুরপো বুঝি কিছু করতে গিয়েছিলে?

বেশ মজা, এবাড়িতে যা কিছু অপকীর্তি হয়, বাবা ভাবেন জ্যাঠাইমার কাজ, জ্যাঠাইমা ভাবেন বাবার কাজ।

প্রভাতকাকা উনুন খোঁচান শিকটা দিয়ে, জ্যাঠাইমার পাশেই ঝাঁঝরি বসান ছোট নর্দমার মুখে খোঁচাখুঁচি শুরু করলেন। জলটা যাতে বেরিয়ে যায়। জানেন না, ও নর্দমাটা কোন কালেই সচল ছিল না। মেহনত দেখে বাবা বললেন—ছেড়ে দাও, ব্যর্থ চেষ্টা। ও বাঙালীর ইঞ্জিনিয়ারিং। জল কখন ওপর দিকে ওঠে শুনেছ!

—আজ্ঞে না।

—ওখানে সেই কায়দাই হয়ে আছে। এলবো আর পাইপ এমন কায়দা হয়ে আছে, বাঁকটা ওপর দিকে।

প্রভাত কাকা তবু খোঁচাচ্ছেন। একটু একগুঁয়ে আছেন। বাবা রেগে গেলেন—শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ কেন বলতো প্রভাত। হবে না বাপু। স্বয়ং বিশ্বকর্মা এলেও ওই নর্দমা দিয়ে এক ফোঁটা জল বের করতে পারবেন না। তুমি বরং হাতে পায়ে ধরে ওই মহিলাকে ওঠাও আর শশীদেব বল ঝাঁট দিয়ে জলটা এদিকের নর্দমা দিয়ে

বের করে দিতে।

মেয়ে মহল থেকে বাবা প্রায় চলেই যাচ্ছিলেন কি ভেবে ফিরে এলেন, একটু ইতস্তত করে অনেকটা স্বগতোক্তির মত করেই বললেন, ওই হ্যারিকেনটায় তেল নেই। কেরোসিনের টিনটা তোমরা কেউ দিতে পারবে। উত্তরটা জ্যাঠাইমার দিক থেকেই এল—কেরোসিন! টিন ঢন ঢন। যা ছিল তুমি ঢেলে নিয়েছ।

—আনানো হয়নি কেন?

জ্যাঠাইমা উঠে দাঁড়িয়েছেন, পায়ের পাতা দিয়ে জলে ঢেউ দিতে দিতে বললেন, তেল আনার মালিক আমরা! দেখলেই তো টিন খালি, নিয়ে এলেই পারতে। বেলা তিনটেয় লাইন দিলে, এতক্ষণে পেয়ে যেতে।

বাবা গুম হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর, জানা রইল, বলে ধীর পায়ে দক্ষিণ মহলের দিকে চলতে শুরু করলেন। প্রভাত কাকা বললেন — ছোড়দা ইলেকট্রিকটা এবার নিয়ে নিন।

দূর থেকে বাবা বললেন—আমার ক্ষমতায় তো হল না, এখন তোমাদের চেষ্টায় কী হয় দ্যাখ।

জ্যাঠাইমা চলে যেতে যেতে বললেন—তোমার মেয়ে জালা উল্টেছে, কাল সকালে রান্নার জলের ব্যবস্থা তুমি করবে। তা না হলে পাতকোর জলে রান্না করে রেখে দোব। পয়সার মুরোদ নেই, বাবুদের সব হাজার রকমের বায়নাক্কা। যাই ছেলেটাকে তুলে খাওয়াই।

পিসিমা শুখনো জায়গায় মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, ও প্রভাত জলের কি হবে! এখন তো রাস্তার কলেও জল নেই।

প্রভাত কাকা বললেন — কিচ্ছু ভাববেন না ছোড়দি। গদা বালতি নিয়ে আয়।

—ও প্রভাত বালতি কি হবে। এখন তো কলে জল নেই।

—নদী থেকে জল তুলব।

—ও প্রভাত গঙ্গার জলে রান্না হয়েছে শুনলে ছোড়দা খাবেনা।

—গঙ্গা নয় ছোড়দি গঙ্গা নয়, সরোবর থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলব, গামছা লে আও। জালার জল জালাতেই ফিরিয়ে দেব। জলের দাম নেই, মাগনা আসে।

— না প্রভাত, ওটা তুলো না, ওর চেয়ে পাতকোর জল ভাল।

—ফুটপাথ দেখেছেন। হাইড্রান্ট দেখেছেন?

—ফুটপাথ দেখেছি, ওই পরেরটা কি বললে, ওটা তো দেখিনি।

আগে উচ্চারণ করুন। বলুন হাই।

—পারব না প্রভাত মুখ্যু মানুষ।

—হাই তুলতে পারেন, আর হাই বলতে পারবেন না বলতেই হবে, বলুন হাই।

—ও সেই হাই।

—এইতো হয়েছে। বলুন হাইড্রান্ট..........

—হাইড্রাম!

—ওইতেই হবে। সেই হাইড্রামের জলে ফুটপাথের নোংরায় শ'য়ে শ'য়ে লোক রাঁধছে, খাচ্ছে, আমরা কি এমন লাট সাহেব! এই জলেই রান্না হবে। স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য করে সবকটাইতো অকালে পরলোকে। এইবার ভাল করে স্বাস্থ্য করাচ্ছি গদা বালতি নিকাল।

প্রভাত কাকা জলটা সত্যি সত্যি তুলে নিতেন কিনা জানিনা। দক্ষিণের বারান্দা থেকে বাবার ডাক শোনা গেল—প্রভাত, প্রভাত। প্রভাত কাকা মার্চ করার কায়দায় লেফট রাইট করতে করতে চলে গেলেন। মেঘের ফাটল থেকে চাঁদের এক চিলতে মুখ বেরিয়েছে। চাঁদটা প্রায় আকাশের মাঝামাঝি এসে গেছে। বারান্দার ঢেউ খেলান টিনের চালের ফাঁকদিয়ে পথ করে নিয়ে, একটা রেখা জলের ওপর এসে পড়েছে ঝলমল ঝলমল করছে, কেউ জানেনা, কেউ জানবেওনা, ওই জলে কি আছে বারান্দার ওই অংশটুকু, ওই জল টুকুতে আমার জীবনের অতীত, মিষ্টি রসের মত গুলে আছে। থাকনা, জলটা সারারাত, চাঁদের আলোয় ওই ভাবেই যদি থাকে ক্ষতি কি!

অত শৈশবের কথা, মনে থাকা উচিত নয়, তবু ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত কিছু দৃশ্য মনের আকাশে আসে আর যায়। পুরো হাতা, গাঢ় নীল একটা সোয়েটার পরে, মাথায় সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে আমার মা খুব ভোরে জামতাড়ার মাঠে আমাকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্যটা যতদিন যাচ্ছে ততই যেন উজ্জ্বল হচ্ছে। দক্ষিণে রাস্তার দিকের যে ঘরটা এখন জ্যাঠাইমার, সেই ঘরটা মার সময় আমাদের ছিল। দুপুর বেলা, মা আমাকে ঘুম পারাচ্ছেন। ঘুম কি আর সহজে আসে। অল্প স্বল্প দুষ্টুমি অবাধ্যতা চলছে। অনেকক্ষণ সহ্যের পর মার মত মারও অসহ্য লাগল। পিঠে গুম গুম করে গোটা দুয়েক কিল পড়ল। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, দরজায় মুখ রেখে হুঁউউ করে ভয় দেখাতে লাগলেন। তারস্বরে কাঁদছি, মা দৌড়ে এসে জলে ভেজা গালে, নিজের ঠান্ডা গালটা রেখে প্রহার আর ভয় দেখানোর দুঃখে নিজেই হু হু করে কেঁদে ফেললেন। মনে থাকার কথা নয়! তবু কেন মনে আছে, অনেক ঘটনার এই একটা ঘটনা! আর মনে আছে, শেষ দিন, যেদিন নিজে হাতে আমাকে চান করিয়ে দিচ্ছিলেন। তারপর আর উঠতে পারেননি। বারান্দার ঠিক ওই অংশটা জল জমে ছোট একটা পুকুর মত হয়েছে। তেল মাখা শরীর নিয়ে মাছের মত মেঝেতে একটু পিছলে পিছলে খেলা হয়েছে। মা করুণ মুখে বলছেন, আজ আর পারছি না রে, আয় জল ঢেলে গাটা রগড়ে দি। ওরে ঠান্ডা লেগে যাবে রে! চারদিকে কি উজ্জ্বল রোদ। মার ফর্সা, মুখ খাড়া নাক, নীল চোখ, ঝুঁকে আছে আমার উঁচু করে তোলা মুখের ওপর। কানের পাশের, গলার তলার জল মুছে দিচ্ছেন। ঠিক পাশের কি একটা গাছে এতবড় একটা কালো ভিমরুল ভোঁ ভোঁ করছে। আর ঠিক তখনই আমার রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমা ডাকলেন—তুলসী তাড়াতাড়ি

আয়, ডাক্তারবাবু এসেছেন। দুটো গাছই বাজে পুড়ে গেছে, তবু, জীর্ণ হলেও বারান্দার ওই নিভৃত পূব মুখ অংশটা আছে। সেই স্নানের সময় যে জলটা জমত সেটা হঠাৎ আবার আজ জমেছে। মা নেই কিন্তু চাঁদের আলো মার স্নেহের মতই ঝিলমিল করছে।

খেয়াল করিনি, ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপে আমার পাশে গদাই এসে বসেছে। বয়সে আমার চেয়ে বছর খানেক বড়। আস্তে আস্তে বলছে—তোমার খিদে পায়নি।

ভোরবেলাই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশের মুখ গোমড়া। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদ বেরোবার চেষ্টা করছে। একটু আগেই কয়লাওয়ালা কয়লা দিতে এসে নিচের পেছল উঠোনে দমাস করে আছাড় খেয়ে বলে গেছে, উঠোন পরিষ্কার না করলে সে আর কয়লা দিতে আসবে না। এত বাড়িতে কয়লা দেয়, কোন বাড়িতে এইরকম উঠোন নেই। বাবা একটু দেরিতে উঠেন তাই! তা না হলে উঠোন পরিষ্কার নিয়ে একটা কান্ড হতই। মাস খানেক হয়ে গেল চুন এনে রেখেছেন, রাতে শোবার আগে ছড়িয়ে দিলেই হয়। কে দেয়? আসলে কেউ মনেই করে না যে এবাড়ির একটা নিচের তলা আছে।

জ্যাঠাইমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে খুব হাসছেন, আর মাঝেমাঝেই সকলকে বলছেন—লোকটা কি রকম পড়ল! ঠিক যেন নৌকোর মত পিছলে গেল—দুম। ঠিক সেদিনের সেই ভিকিরিটার মত। চোখের সামনে আমিও দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু হাসি পাচ্ছে না, ভীষণ লজ্জা করছে।

মাথায় অতবড় একটা ভারি বোঝা। যতই অভ্যাস থাক সরু ঘাড়টা ওজনের ভারে লগবগ করছে। পরনে একটা লুঙ্গি। তলা থেকে ভাঁজ করে হাঁটুর ওপরে তোলা। গায়ে একটা ছেঁড়া,ময়লা, স্যান্ডো গেঞ্জি। পেছল উঠোনে পা রেখে, বোঝাসুদ্ধ নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার কি চেষ্টা! রোগা রোগা, শির বের করা দুটো হাতই মাথার বস্তাটা ধরে রেখেছে। সারা মুখে ভীষণ একটা আতঙ্ক! শেষে তাকে পড়তেই হল। বিশ্রী ভাবে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। কয়লার বস্তাটা ধপাস করে উঠোনের নর্দমায় গিয়ে পড়ল। কিছু কয়লা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। ভাঁজ করা লুঙ্গি এমন জায়গায় উঠল, যেখানে না উঠলে লোকটি হয়তো এত লজ্জা পেত না। বড় মানুষ, মেয়েদের সামনে পড়ে যাওয়াটাই লজ্জার, তার ওপর যদি লুঙ্গি স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তা আরো লজ্জার।

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দর্শকরা সব হাসছে। অসম্ভব পেছল উঠোনে লোকটি পশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। জল, কাদা, সাবানের ফেনা ভাতের ফ্যান, মানুষের ত্যাগ করা জল, সব মিলিয়ে সভ্য মানুষের নিজের হাতের তৈরি নরক। এক সিকি মুটে ভাড়ার জন্যে একটা মানুষের কত কষ্টস্বীকার। নিজের

চেষ্টায় আবার সে উঠে দাঁড়াল। নর্দমা থেকে রোগা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বস্তাটা উঠিয়ে, সিঁড়ির ঘরে খালি করে দিল। ছড়ান কয়লা সব তুলে ফেলল তারপর ঘামে ভেজা মুখ, কাদা মাখা শরীর নিয়ে ওপরের বাবুদের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল।

বারান্দার সেকালের কোনও জমিদারবাবু দাঁড়িয়ে থাকলে, হাসি মুখে বলতেন — খুব আনন্দ দিয়েছ হে ছোকরা। তোমাকে দেখে আজ মালুম হল মানুষে আর পশুতে তফাৎ হল টাকার। টাকা থাকলে মানুষ, না থাকলেই পশু। এই নাও সিকির বদলে গিনি।

সিকিটা নিয়ে লোকটি সবে চলে গেছে। শ্যাওলার ওপর তখনও পুরো একটা মানুষের ছাপ, হাঁচর পাঁচর করার নানা দাগ। জ্যাঠাইমার হাসিটাও মরে এসেছে। রান্না ঘরের সামনে ছোটএকটা আনাজের চুবরিকে ঘিরে ছোটখাটো একটা অশান্তি দানা পাকিয়ে উঠছে। একপাশে জ্যাঠাইমা আর একপাশে পিসিমা। জ্যাঠাইমা বলছেন — এই তো, এই কটা আলু, দুটো গুলি গুলি উচ্ছে, কয়েকটা পটল, নাও কি খাবে খাও। ওই বাপ-ছেলেকে যা হয় ফুটিয়ে দিয়ে উনুনে জল ঢেলে দাও। বাজারের কথা বলতে গেলেই তো উনি তারিখ দেওয়া হিসেবের খাতা বের করে বলবেন, তিন দিনের বাজার একদিনে শেষ হয় কি করে! তোমার সাহসে কুলোয় তুমি যাও।

জ্যাঠাইমার বোলচাল বেশি। এ বাড়ির দু'নম্বর মেজ বৌ। ফর্সা, সুন্দরী। বাপের বাড়ি পড়তি জমিদার। তবু জমিদার তো। পিসিমা, বাবার বোন। স্কুল শিক্ষকের মেয়ে। পাড়াগাঁর বৌ। গায়ের রং ময়লা। অসহায়। সম্বলহীন বিধবা। ভাইয়ের গলগ্রহ। খাটো খাও। বঁটিতে আলু ছুলতে ছুলতে পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, ভাজা না ডালনা?

জ্যাঠাইমা ব্যাঙ্গের হাসি হাসি বললেন, ভাজা? তোমার ভাইয়ের ভাজা খাবার মুরোদ আছে! একপলা তেল। দু-ফোঁটা দুই নাকের গর্তে, দু-ফোঁটা দু কানে, এক ফোঁটা নাইকুন্ডুলে, রইল বাকি এক। ভাজতে পার ভাজার কোটো। বাপের জন্মে এই ভাবে সংসার করিনি, করতেও পারবনা। তোমরা চিরকালে দুকচেটে, সেখানেও জুটতনা, এখানেও জুটছে না। ঠাকুর জামাইতো রেস খেলে, মদ খেয়ে সব পথে বসিয়ে গেছে। কি আর করবে বল। গতর আছে, পারতো খেটে খাও।

সিঁড়ির কাছে পুবের রোদে বসে কেড়সে খড়ি মাখাতে মাখাতে জ্যাঠাইমার কথা শুনছি। পিসিমার বিষণ্ণ শুখনো মুখ, লজ্জায় অপমানে এতটুকু হয়ে গেছে। অন্যমনস্ক, বঁটির ফলায় একটা বেঁটে পটল ধরে আছেন। ক্যাঁচ করে দু'আধখানা করবেন, না ফ্যাঁস করে লম্বালম্বি দু'ফালা করবেন বুঝতে পারছেন না।

জ্যাঠাইমার কথার মার প্যাঁচ থেকে পিসিমা এইটাই বুঝলেন ভাজা হবে না, অন্য যা হয় কিছু হবে। পটলটা সবে দু'আধখানা করেছেন উঠোনে দুম করে আবার

একটা শব্দ হল। পিসিমার বড় মেয়ে মালা চিৎকার করে উঠল—মাথা ফাটা পড়েছে বটেক। পিসিমা বঁটি ফেলে লাফিয়ে বারান্দায় এলেন, পরপর আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছি, গদাইয়ের পতন দেখতে। পিসিমার দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—মড়া ওখানে মরতে গেছ কেন?

আরও হয়তো কিছু বলতেন বলা হল না। গঙ্গায় স্নান সেরে বাবা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। একেবারে গদাইয়ের পেছনে।একটু উঁচু করে পরা গেরুয়া রঙের লুঙ্গি। সামনে ঝুলছে ভাঁজ করা ভিজে লাল গামছা। চওড়া বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে মোটা পৈতে। ঠোঁট দুটো ঝিঁঝি পালকের মত কাঁপছে। মন্ত্র জপ করছেন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কিন্তু উদাস। দূর থেকে দেখলেও মনে হয় শরীরের সঙ্গে মনও শীতল হয়েছে স্নানের পর। কিন্তু গদাইয়ের অবস্থা দেখে এখুনি জ্বলে উঠলেন বলে।

গদাই যেন সামনে বাঘ দেখেছে। করুণ গলায় বললে ছোট মামা পড়ে গেছি।

—সেতো দেখতেই পাচ্ছি। এখন উঠে পড়।

গদাই ওঠার চেষ্টা করে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। বরং আরো খানিকটা হড়হড়ে নর্দমার দিকে চলে গেল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তোর প্যান্টের পকেট থেকে হলদে হলদে কী বেরচ্ছে ওটা।

—ডিম ছোট মামা।

—ডিম, ডিম নিয়ে এই ভাগাড়ে কী করতে এসেছিস, তা দিতে।

উত্তরটা ওপরের বারান্দা থেকে জ্যাঠাইমা ঝুলিয়ে দিলেন—তোমার ডিম।

—আমার ডিম! বাবা অবাক হয়ে ওপর দিকে তাকালেন। আমার ডিম মানে।

—রাজেনের দোকান থেকে ডিম এসেছিল। পচা বেরিয়েছে। তাই পাল্টে আনতে গিয়েছিল।

—তোর হাতে ঠোঙ্গায় ওটা কী?

—ডাল বড়া ছোট মামা।

—ডাল বড়া? কে খাবে?

—মেজ মাইমা।

বাবা ওপর দিকে না তাকিয়েই বললে শশী, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা না দেখে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যা। একটা লাঠি এনে দূর থেকে বাড়িয়ে দে ধরে ধরে উঠুক। তারপর কুয়োতলায় ফেলে জল ঢাল।

উঠোনের স্বভাব যারা জানে তারাই চেনে কোন অংশটা নিরাপদ। বাবা তার মধ্যে একজন। নিরাপদ অংশ দিয়ে তিনি বাঁধানো কুয়োতলায় এসে উঠলেন। ঠোঁট আবার দ্রুত নড়তে শুরু করেছে। দড়ি বাঁধা বালতিটা পাতকোয়ায় নামাতে নামাতে একচিলতে বাগানের কোণে ঝাঁকড়া ডুমুর গাছটার দিকে তাকালেন। গঙ্গায় এই

পাটকরা গামছা থেকে পায়ের কাছে অজস্র কাঁকড়া পড়ে বিড় বিড় করছে।

জ্যাঠাইমা রান্নাঘরের দিকে আসতে আসতে বললেন—ঠাকুরঝির ছেলেটা একেবারে ঢ্যাঁড়স। কোন কম্মের নয়। এখন ঠাকুরপোকে কি দিয়ে ভাত দেব। তোমার ঠ্যালা তুমি সামলাও।

মালা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, জ্যাঠাইমার কথা শুনে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল—যাঃ বেশ বলছ বটেক মাইমা! সব দোষ আমাদের বটেক। বাবা মরে গেছে বলে পেছল উঠোনে ছোট ছেলে পড়ে যাবে না। পড়ে গেলে ডিম ভাঙবে না। চল মা, আমরা বেলেঘাটার লাবুদের বাড়ি চলে যাই বটেক।

—কোন চুলোয় যাবি? তোদের যাবার কোন চুলো আছে। যেমন পেতনীর মত চেহারা, তেমনি ছোটলোকের মত মুখ। যা না, যা, তোদের সম্পত্তি - টম্পত্তি নিয়ে চলে যা। দেখি কে রাখে এই রাবণের গুষ্টিকে।

মালার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নিঃশব্দ ধারায় জল নেমে আসছে ভাঙাগাল বেয়ে। বাবা উঠে আসছেন ওপরে। লাল টকটকে গামছাটা পরেছেন। কাঁধের ওপর গেরুয়া লুঙ্গি। যেন এক সন্ন্যাসী। হেমকুন্ডু থেকে উঠে এলেন। সামনেই মালা। স্পষ্ট চোখ তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো ভিজে।

বাবা নরম গলায় বললেন-কাঁদছিস কেন? এই তো সবে শুরু রে। তোর মাকে দেখে শেখ। সারা জীবন শুধু ধাককা খেয়ে গেল। তোরা জানিস না আমি জানি। গরিবের মেয়ে, রূপ নেই, বিয়ে হল যার সঙ্গে—থাক আর বলে কাজ নেই। তুই না বড় মেয়ে।

বাবার একটা হাত মালার মাথায়, আর এক হাতে ভিজে লুঙ্গি। শুকনো মেয়েটার চোখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। জ্যাঠাইমা পেছন থেকে বললেন—কষ্ট তোমার বোনই শুধু করেছে, আমরা সব লাকসারিতে ডুবে আছি, এক চোখো কোথাকার।

—তুমি আর কষ্ট করলে কোথায় বৌদি? তোমার কত অহঙ্কার, রূপ, জমিদারি, বড় বড় আত্মীয়স্বজন।

—তাই না কি?

চুলপাড় শাড়ির খানিকটা অংশ ফরফর করে কোমরের কাছ থেকে খুলে বাবার চোখের সামনে উর্বশীর মত মেলে ধরে বললেন—এই তো কনট্রোলের গুন চট। পেটে একবেলাও ভাল করে জোটেনা। নিজে তো খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যান। অন্যের খবর কিছু রাখেন আপনি।

রোদে ভিজে লুঙ্গিটা মেলে দিতে দিতে বললেন—মেজদার অসুখে ফতুর হয়ে গেছি, সামলাতে না সামলাতেই চাপের ওপর চাপ, তার আগে দু'বৌ শেষ করে দিয়ে গেছে। ওই মোটা কাপড় আর রেশনের চাল জুটছে, এর জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও।

—কি কেবল মেজদার অসুখ, মেজদার অসুখ দেখাও। ঘোড়ার ডিমের

চিকিৎসা। বিনা পয়সার হাতুড়ে ডাক্তার বিশু ঠাকুরপো। না একটা ভাল ডাক্তার, না ভাল ওষুধ পথ্য, তাওতো সব প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকায়। মেজদার অসুখ দেখাচ্ছেন উঠতে বসতে। বাবা হাত দিয়ে টেনে টেনে লুঙ্গিটাকে নিখুঁত নিভাঁজ করে দিলেন। দরজার সামনে দু'ভাঁজ করে রাখা চটে পা মুছে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—জানা রইল মরার আগে আর চাকরি ছাড়ার আগেই প্রভিডেন্ড ফান্ড পাওয়া যায়। আমার যতদূর মনে পড়ে অনেক লেখালিখি করে, যতীকে দিয়ে সাহেবকে ধরাধরি করে এই সেদিন মেজদার প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি পাওয়া গেছে। যা পাওয়া গেছে, সবই তোমার নামে পোস্টাপিসে জমা দিয়েছি। মাঝে মাঝে তুলছো আর গবার তেলে ভাজা খাচ্ছ। দুঃখু হয় ওই আর একটা দুর্ভাগার জন্যে। পড়া নেই, শোনা নেই, সকাল নটা প্রায় বাজল, এখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে।

—ওর ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যা ভাববে জানা আছে। তোমার কেবল গেল গেল, মল মল।

বাবার কথা শুনে জ্যাঠাইমার হঠাৎ ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা প্রবল হয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে বাবুকে ঝাঁকাতে লাগলেন—এই বাবু ওঠ, ওঠ, ওঠ, ওঠ। কাল সন্ধ্যে সাতটা থেকে পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিস, সকাল নটা বাজল।

আমাদের বড় ঘরটাকে একটা হল ঘরই বলা চলে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। পূবে কোন জানলা নেই।

জানলা-ফোটাবার উপায় নেই। আইনে আটকাবে। চার ফুট না ছেড়েই, গায়ে গায়ে আর একটা বাড়ি। বাড়ি নয়, খানকতক বস্তি বাড়ি। সুন্দর পুব দিকটা মাঠেই মারা গেছে। সেই পুব দিকের দেয়ালে একটা নোনা ধরা ত্রিতল কুলুঙ্গি আছে। প্রত্যেক তলে কাগজ বিছিয়ে পরিপাটি করার চেষ্টা হয়েছিল। অনবরতই সে দেয়ালে ঝুরঝুর করে বালি ঝরছে কান পাতলেই কাগজে বালি ঝরার শব্দ, সেই কুলুঙ্গি কতই বা পরিষ্কার থাকবে।

নিচের তাকে একটা ছোট আয়না, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। কাঁচটা আড়াআড়ি ফেটে গেছে। হাতল-ওলা বুরুশে পুরুষদের একটা চিরুনি খাড়া করে গোঁজা। আরো সব নানা জিনিস, তিনটেতাকে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। বাবা খুব দ্রুত, ভিজে গামছাটা পরেই পুবের তাকটার দিকে গুম গুম করে এগিয়ে গেলেন। এইটাই অবশ্য তাঁর রোজের পদ্ধতি। ওখানে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার উপায় নেই। অন্ধকার মত জায়গা, কালো ছোপধরা আয়না। আয়নাটা হাতে নিয়ে উত্তরের বারান্দার পূবধারে বেরিয়ে এলেন। সেখানে ছটা ঘুলঘুলি দিয়ে রোদ ঢুকছে। টিনের চাল, গড়িয়ে বাগানের দিকে নেমে গেছে। গোটাকতক পেয়ারা ডাল বারান্দায় এবড়ো কাঠের রেলিঙে খোঁচা মারছে। এইখানে দাঁড়িয়ে মাথাটা সামনে ঘুরিয়ে বাঁ হাতে আয়না ধরে চুলে চিরুনি বুলোতে লাগলেন। ছিটকে ছিটকে জল পড়ছে আয়নার কাঁচে।

সকাল থেকে অফিস বেরোন পর্যন্ত বাবার সমস্ত কিছু সুন্দর নিয়মে বাঁধা। শুতে যেমন দেরি হয়, উঠতেও তেমনি একটু দেরি হয়ে যায়। যখনই দেখা যাবে জুতো বুরুশ করে, গোড়ালির ওপর খাড়া করে খটাস খটাস তখনই বুঝতে হবে মিনিট খানেকের মধ্যেই সদরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন গঙ্গার স্নানে।

যখনই দেখা যাবে পূবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একহাতে আয়না দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছেন। তখনই ওই লম্বা ঘরে, উত্তরের জানালা ঘেঁষে খাবার আসন পাততে হবে। ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে এক গেলাস জল। যেখানে থালা বসবে সেখানে একটু জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে মেঝেটা মুছে দিতে হবে। খাবার যেমনই হোক, এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম বর্বরতার শামিল।

চুল আঁচড়ানো হয়ে গেল, আসন কিন্তু পড়লনা আজ। ঘড়ি গোলমাল হয়ে গেছে। পিসিমা বাবার নির্দেশমত কুয়োতলায় গদাইদার গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছেন। জ্যাঠাইমার রাগ হয়েছে। বাবু কে ঘুম থেকে ঠেলে তুলেই পড়াতে বসিয়েছেন। মুখ ধোবারও অবসর দেননি। মাছের ইংরেজী কি ? ফিশ্। মাছ আর দেখলি কোথায় বল্, যে ইংরেজি বলবি। সে মাছ দেখেছি আমরা। দক্ষিণের বড় পুকুরটায় বাবা রোজ সকালে জাল ফেলাতেন—কালবোস, মৃগেল, রুই। মালা ছাদের সিঁড়ির প্রথম ধাপে গালে হত দিয়ে চুপ করে বসে আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে কোনো বৃদ্ধা বসে আছে।

বাবার কাপড় পরা হয়ে গেল। এইবার সিল্কটুইলের সাদা পুরো হাতা শার্ট পরবেন। তার ওপর বুকখোলা গ্যাবার্ডিনের কোট। হাতে থাকবে ছোট মত সাদা একটা কাপড়ের ব্যাগ। ব্যাগে থাকবে এইসব জিনিস —চশমা, চাবি, খাবার পান। আর থাকবে কালো বেতের বাঁটের বারোমেসে ছাতা।

আমার যেমন মা নেই, বাবারও তো তেমনি স্ত্রী নেই। কে দেখবে বাবাকে। বাবা সংসার থেকে যেটুকু পান, তার কোনটাই ভালবাসার পাওনা নয়। ভয়ের দান। ব্যাগ গুছিয়ে দেবার দায়িত্বটা আমার। আগে প্রায়ই ভুল হত। চশমা ঢুকল তো চাবি পড়ে রইল। শেষ মুহূর্তে টিফিনের মোড়কটা রান্নাঘর থেকে হয়তো এলই না।

ব্যাগে চশমা ঢুকিয়েছি। কালো খাপে সৌখীন সোনালী চশমা। একতোড়া ঝকঝকে চাবি। অফিসের আলমারির। চৌকো অ্যালুমিনিয়ামের পানের ডিবেটা আছে। সাজা পান নেই। খাবার নেই। শীতকাল নয়, মাফলার এমনিই বাতিল। ছাতাটা চেয়ারের পেছনে ঝুলছে। বাবা একদম রেডি। ঠাকুর্দার ছবিতে প্রণাম করছেন। জুতোর গাদা থেকে একটু আলাদ হয়ে ঝকঝকে একজোড়া কালো নিউকাট, প্রফুল্লবাবুর ঝকঝকে কালো গাড়ির মত আরোহীর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনছে।

জ্যাঠাইমা নিজের ঘরে ঠ্যাং তুলে শুয়ে হাতপাখা নেড়ে নেড়ে বাবুকে কাঁঠালের ইংরেজী শেখাচ্ছেন। বল- জ্যাক ফ্রুট। আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাঁঠাল বাগানে ভুই

কাঁঠালের গাছ ছিল জানিস। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দেওয়া হত আর রাতে আসত শেয়াল। শেয়াল আসতো বলেই জ্যাঠাইমা খুঁক খুঁক করে হাসছেন। আমি ঘরে ঢুকে বললুম— বাবার তো সব হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাচ্ছেন খেতে দেবেন না।

হাসিটা থামল, পাখা নাড়াটা বন্ধ হলনা। হাতপাখার হাওয়া খেতে খেতেই বললেন—খেতে দেবার অনেক লোক আছে, তাদের দিতে বল, প্রাণের লোক, মনের লোক, আপনার লোক।

জ্যাঠাইমা প্রায় গান গাইবার মত সুর করে শেষের কথাগুলো বললেন— বাবু অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাছের ঠ্যালা সামলে সে এখন কাঁঠাল বাগানের শেয়ালের ধাককায় পড়েছে।

উত্ত র মহলে পিসিমার দিকে দৌড়লুম। সারাদিনের মত একটা মানুষ না খেয়ে বেরিয়ে যাবেন। গদাই ভিজে জামা প্যান্ট পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পিসিমা মালাদির একটা ফ্রক হাতে নিয়ে ছেলেকে বোঝাচ্ছেন—এইটা এখন পর বাবা। আর তো জামা-প্যান্ট নেই। রোদে দিয়ে দি এখুনি শুকিয়ে যাবে।

—ও আমি পরবক নাই বটে। গদাই ঘাড় বেঁকিয়ে গোঁ ধরেছে।

পিসিমা এবার খুব রেগে গেছেন—তবে ল্যাংটা হয়ে থাকগে যা বটেক!

পিসিমা করুণ মুখে আমার দিকে তাকাতেই বললুম—বাবা যে না খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন! বাবা ওদিকে সদরের সিঁড়ি থেকে বলছেন—কই বল, দুর্গা দুর্গা! পিসিমা আর আমি দু'জনেই দৌড়লুম।

—ও ছোড়দা না খেয়ে যেওনা। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

—তুই কি ব্যবস্থা করবি শশী। ভগবান আজ মাপাননি। ভগবান না দিলে মানুষ কি করবে বল?

—তা কি হয় ছোড়দা! তুমি খেয়ে যাও।

বাবা সিঁড়ির একটা ধাপ নেমে বললেন— বল দুর্গা, দুর্গা।

দুর্গা দুর্গা হল স্টার্ট দেবার মন্ত্র! ওটা কিছুতেই বলব না। বাবা আর এক ধাপ নেমে বললেন—বল দুর্গে, দুর্গতিনাশিনী। হঠাৎ শোনা গেল প্রভাত কাকার গলা। নিচে থেকে ওপরে উঠছেন। সকাল থেকে দেখিনি। প্রভাত কাকা উঠছেন আর বলছেন—ওরে আমি বড্ড বিজি প্রোফেসান্যাল ম্যান, বড্ড বিজি প্রোফেসান্যাল ম্যান, স্যাচু মারি খ্যাং খেলি, কি দিয়ে তুই ভাত খেলি। কি দিয়ে তুই ভাত খেলি।

একবারে বাবার মুখোমুখি, বাবা নামছেন। কাকা উঠছেন। পিসিমা প্রবল আকুতি মেলান গলায় বলছেন—ও ছোড়দা খেয়ে যাও। প্রভাত কাকা বড় পৈঠেতে সরে গিয়ে বাবাকে পথ করে দিতে যাচ্ছিলেন। যেই শুনলেন খেয়ে যাও, পথ জুড়ে দাঁড়ালেন। বাঘবন্দী। এইবার কি হয়! গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, ফর্সা, লোটানো কাপড়। এক হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। দুটো হাত দু'দিকে বাড়িয়ে প্রভাত কাকা আদেশের সুরে বললেন—উঠুন ওপরে। ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে।

—আমার কতগুলো নিয়ম আছে প্রভাত। বেরোবার জন্যে, দুর্গা-দুর্গা বলে একবার সামনে মুখ করলে আমি তো আর পেছনে ফিরে তাকাতে পারিনা। সোজা আমাকে নেমে যেতে হবে। তারপর রাস্তায় প্রথমেই আমাকে ডানপা ফেলে বেরোতে হবে।

—দেখুন তো ছোড়দা এখন আপনার কোন নাকে শ্বাস প্রবল!

—দক্ষিণ নাসিকায়।

—তবে! ভোজ্য, স্নানে ব্যবহারে ক্রুরে দীপ্তে রবিঃ শুভঃ ভোজন স্নান এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধাদি, শত্রুর অনিষ্ট সাধনাদি যতরকম ক্রুর কর্ম আছে তাহা দক্ষিণ নাসায় শ্বাসপ্রবাহকালে অনুষ্ঠিত হইলে সুসিদ্ধ হয়। শাস্ত্রই একথা বলেছে ছোড়দা। এতএব এখন আপনার ভোজনের সময়। চলুন, উঠুন।

—আমি পেছনে ফিরতে পারবোনা প্রভাত।

—ফিরতে হবেনা আপনাকে। নিন পেছনে উঠুন।

প্রভাত কাকা সামনের দিক থেকে বাবার দুটো হাতের ওপর দিকটা ধরে, সাবধানে তিনটে সিঁড়ি তুলে দিলেন। তুলে দিয়ে বললেন—নিন জুতো খুলুন। কৌটটা খুলুন। ছাতা আর ঝোলাটা রাখুন। জামার হাতা গোটান। খেতে বসুন। ছোড়দি!

—এই যে প্রভাত।

—ঠাঁই করুণ।

বাবা ছাতাটা চেয়ারে ঝুলিয়ে বললেন— খুব মুশকিলে ফেললে প্রভাত। দেরি হয়ে যাবে!

—মানুষ দুটো খাবার জন্যে খুন করছে, মা ছেলে বিক্রি করছে, আপনার একটু দেরি হবে ছোড়দা, হোকনা, কত আর দেরি হবে দশ মিনিট, পনের মিনিট,। আমি সাইকেলের পেছনে বসিয়ে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আসব। লেট-মেকআপ হয়ে যাবে।

—মাপ কর প্রভাত। সাইকেলের পেছনে বসে আমি যেতে পারবোনা। উল্টে পড়ে যাব।

কথা বলতে বলতে জুতো খুলে ফেললেন। প্রভাত কাকা ঝটপট করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। পিসিমা ফিসফিস করে বললেন, ও প্রভাত! শুধু তো ভাত আর ডাল হয়েছে আর তো কিছু হয়নি। কি দিয়ে খেতে দেব!

—বাঃ সারা সকাল দু'জনে মিলে এই করেছেন। ওরে আমার নন্দরাণী।

প্রভাত কাকা পিসিমার নাকটা নেড়ে দিলেন!—ওই দিয়েই বসিয়ে দিন। আমি রাজেনের দোকান থেকে ঝপ করে একটা মামলেট মেরে আনি। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে পেছল উঠোন পেরিয়ে প্রভাত কাকা ছুটলেন রাজেনের দোকানে।

বাবা খেতে বসেছেন। গুন্ডুষ হয়ে গেল। পাতের পাশে মেঝেতে ভাগে ভাগে ভাত সাজালেন, তার ওপর জল ঢাললেন থালায় চারপাশে জলের বেড় পড়ল।

আচমন হল। ভাত ভেঙে ডাল ঢালতেই মুখের চেহারা পাল্টে গেল। থালায় যে জিনিসটা রয়েছে তাকে ভাত না বলাই ভাল। সঙ্ঘবদ্ধ অন্ন। আঠা আঠা দলাপাকানো একটা তাল। কিছু তিল ছড়ালেই পিন্ডি। ডাল ঢেলেছেন, যেন শিবের মাথায় হলুদ জল। পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন — এটা কী!

পিসিমা বললেন—রেশানে এবার ওই দিয়েছে ছোড়দা।

প্রভাত কাকা, ডিশে করে মামলেটটা থালার পাশে রাখতে রাখতে বললেন — মিলিটারী চাল। গরম জলে শুধু ভেজালেই ভাত। কতক্ষণ ফুটিয়েছেন ছোড়দি।

ছোড়দি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কেরামতিটা জ্যাঠাইমার। এদিকে বাবা যতবার গ্রাস তুলতে যান চটচটে ভাতের ড্যালা থালাটাকে মেঝে থেকে দু'তিন ইঞ্চি ওপরে উঠিয়ে একসময় ধপাস করে ফেলে দিচ্ছে। পাতের পাশে, ভাত ঘিরে, ডালের মারাঠা ডিচ থেকে, ডালের জল ছিটকে ছিটকে বাবার গেঞ্জিতে, হাঁটুর ওপরের কাপড়ে লাগছে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জামাটা খুলে ফেলেছিলেন। বাবা বললেন, এঃ, আবার চান করতে হবে প্রভাত।

প্রভাতকাকা বললেন—ছোড়দা এ ভাত লোহার থালা থেকে খাওয়া উচিত। দাঁড়ান থালাটার ওয়েট বাড়িয়ে দি। কাঠের আলমারির তলায় কিছু লোহার বাটখারা ছিল। সবচেয়ে ওজনদার যেটা সেটা হাতে নিয়ে প্রভাত কাকা এগিয়ে এলেন। বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কি হবে প্রভাত।

—এটা থালা-ওয়েট। থালার মাঝখানে এটাকে বসিয়ে দেখুন তো কি হয়!

বাবা হাসলেন—তোমার ব্রেন আছে প্রভাত। তবে আমি প্রায় মেরে এনেছি।

প্রভাত কাকা বললেন—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতঃ বলং।

—ডিম ভাজাটা তুমি কোত্থেকে পেলে! ডিমটাতো গদাইয়ের প্যান্টের পকেটে ছিল।

—আপনাকে ভাবতে হবে না। দেওয়া হয়েছে খেয়ে নেবেন ।

—দেওয়া হয়েছে মানে। তুমি কি হাঁস যে ইচ্ছে করলেই ডিম দেবে। আমার একটা হিসেব আছে, বাজেট আছে।

—আমি রাজহংস, পরমহংস। ওসব বাজেট, হিসেব ঘোর সংসারীর জিনিস—

—তুমি কে?

—আমি কে জানতে হবে। এখন ঈশ্বর আপনাকে যা মাপিয়েছেন তাই খেয়ে উঠে পড়ুন।

দ্বিতীয় যাত্রার জন্যে বাবা সিঁড়ির মুখে প্রস্তুত। পনের মিনিট লেট। প্রভাত কাকা জিজ্ঞেস করলেন কোন নাকে পড়ছে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন কোন নাকে পড়ছে! সেই দক্ষিণ নাসায়।

প্রভাত কাকা বললেন—বামাচার প্রবাহেণ নাগাচ্ছেৎ পূর্ব-উত্তরে, দক্ষনাড়ী

প্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ যাম্য পশ্চিমে। বাম নাসিকায় শ্বাসপ্রবাহের সময় পূর্ব এবং উত্তরে যাত্রা করিবে না। দক্ষিণ নাসায় শ্বাসবহনকালে দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাত্রা করিবেনা। আপনি যাবেন পূবে। ঠিকই আছে দুর্গা—দুর্গা।

আমরা কোরাসে বললুম—দুর্গা, দুর্গা সিদ্ধিদাতা গণেশ, দুর্গে, দুর্গতি নাশিনী!

দিদির ফ্রক পরে গদাইদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—চলে গেছেন বটেক।

—হ্যাঁ চলে গেছেন।

গদাইদা মুখটা করুণ করে জিজ্ঞাসা করল—তোমার খিদে পায় নাই বটেক।

উত্তর দিতে হল না। প্রভাত কাকা গদাইয়ের বেশ দেখে হিহি করে হেসে বললেন—গদাইয়ের স্ত্রীলিঙ্গ কি হবে। জানিস না তো? নদ, নদী, গদাই-গদী। তোর প্যান্ট জামা নেই?

—একটা ছিল কেচে দেওয়া হয়েছে জামা।

প্রভাত কাকা ঝট করে নিজের পৈতেটা খুলে ফেললেন—আয় এদিকে। এগিয়ে আয় এদিকে।

দর্জি যেভাবে ফিতে ধরে, মাপ নেবার জন্যে প্রভাত কাকা সেইভাবে মেঝেতে এক হাতে পৈতেটা ঝুলিয়ে বসলেন।

—আয় এদিকে আয়, গদা, গদাই, গদী। গদাইদা দূরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। শেষে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

—তোল, তোল তোর ফ্রকটা। প্যান্টের মাপ নেব। তুই কি বলে মেয়েদের ফ্রক পরলি। তুই না পুরুষ মানুষ। প্রভাত কাকা গদাইকে বকছেন আর মাপ নিচ্ছেন। প্রথমে কোমর। তারপর ঝুল। ঝুলের মাপ নেবার সময় হাঁটুটা কোথায় দেখার জন্যে ফ্রকটা ফস করে ওপর দিকে ওঠাতে যাচ্ছিলেন, গদাইদা সামনের দিকে বাঁশপাতার মত নুয়ে পড়ে ফ্রকটার সামনেটা দু'হাতে চেপে ধরে আহত মানুষের মত আর্তনাদ করে উঠল—

—ও প্রভাত মামা, না না না।

প্রভাত কাকা চমকে উঠে বললেন—কী হল রে। ঘাটা আছে নাকি, দাদ, কাউর?

—না মামা, তলায় আমার কিচ্ছু পরা নেই বটেক।

—ইয়া আল্লা। তোবা। তোবা। প্রভাত কাকা পেছনে দিকে উল্টে, মেঝেতে কুমড়োর মত গড়িয়ে পড়লেন। ফুলে ফুলে হাসছেন। বহু রকমের হাসি খ্যা,খ্যা,খি,খি,হি,হি, হো,হো। হঠাৎ হাসি থেমে গেল। আলো জ্বালা আর নেভার মত। উঠে বসলেন। অসম্ভব গম্ভীর মুখ চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। উঠে দাঁড়ালেন। চোখের কোণে জলের বিন্দুটা মুক্তোর দানার মত বড় হচ্ছে।

আমি অবাক, গদাই অবাক। কী হল হঠাৎ। এই তো হাসছিলেন। গদাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল প্রভাত মামা? প্রভাত কাকা সাদা আদ্দির পাঞ্জাবিটা পরতে পরতে বললেন, সে তুই বুঝবিনা গদাই। পৃথিবীটা বড় বিচিত্র জায়গারে?

আমার পোশাকটা দেখেছিস, একে বলে রাজবেশ। তোরটা দেখেছিস, তোর মার কাপড়টা দেখেছিল, তোর দিদির জামাটা দেখেছিস।

আমরা সকলেই সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। একই পরিবারে এক একজনের এক এক অবস্থা। জ্যাঠাইমা পাখা হাতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এদিকে ওদিক তাকিয়ে বললেন, বেরিয়ে গেছে। পড়ে-থাকা এঁটো থালাটার দিকে তাকিয়ে একটু সুরেলা গলায় বললেন সেই তো মান খসালি লোককে কেন হাসালি।

প্রভাত কাকা জুতো পরতে পরতে বললেন—উফ্, মেয়েছেলে কি চিজ রে বাবা!

জ্যাঠাইমা হাসি হাসি মুখে বললেন বিয়ে না করেই বুঝে গেছ দেখছি।

প্রভাত কাকা একধাপ সিঁড়ি নেমেছেন, জ্যাঠাইমা বললেন—ছোড়দা ছোড়দা করে খুবতো আদিখ্যেতা করলে প্রভাত ঠাকুরপো, এখন আমাদের গেলার কি ব্যবস্থা হবে। প্রভাত কাকা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—চালাও ফুলুরি ঝাল দিয়ে ভাত।

—মন্দ বলনি। বেশ ঝাল ঝাল ভালই জমবে। তবে এত বেলায় গবার ফুলুরি কি পাবে!

জ্যাঠাইমা সব জানেন। গবা কখন কি ভাজে, কখন কি ফুরোয়। সকাল আটটার মধ্যে ফুলুরি শেষ, নটার মধ্যে ডালবড়া, এই নটা সাড়ে নটার সময় পড়ে আছে চপ আর বেগুনি কিম্বা পটুলি। পলতার বড়া গোটা কতক থাকতে পারে। বাবা কি সাধে বলেন গবার বাড়িটা হয়েছে জ্যাঠাইমার জন্যে। এইবার দোতলা হবে, তিনতলা হবে। জ্যাঠামশাইয়ের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা, তোল আর খাও।

জ্যাঠাইমার কথায় কান না দিয়ে প্রভাত কাকা বললেন—গদাই গুনে ফেল তো আমরা ক'জন। গদাই গুনে গেথে বললে আটজন মামা। ঠিক করে গোন, আটের বেশী। না, আমি ঠিক গুনেছি বটেক। না বটেক, এই দ্যাখ, গোন ভাল করে, আমি, প্রভাত, তুই গদাই, ছোড়দি, শশী, বৌদি নন্দিনী ক'জন হল এইখানেই তো আটজন হয়ে গেল, আরো আটজন হবে। মোট ষোল জন। গদাইদা একটু ভেবে বললে—হ্যাঁ চালাকি বটেক। একই নাম আপনি দুটো করে দিচ্ছেন। আমি আর প্রভাত এক লোক বটেক?

—তুই আর প্রভাত এক লোক বটেক! একি তোর গ্রামদেশ পেয়েছিল। বাবা আর তোর কাকা এক হয়ে, কাকা বিষয়টা মেরে দিল।

—তুই না, তুই না, আমি আর প্রভাত এক বটেক।

—আবার আমি আর প্রভাত এক বলছিস! আমি আমি। প্রভাত প্রভাত। তুই আর আমি এক হব কি করে। আমার মত তোর দাঁত আছে? তোর টাঁকে ক'পয়সা আছে। বের কর দেখি।

গদাই ঘাবড়ে গেল। ট্যাকাই নেই তো ট্যাকে পয়সা। গদাই অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল। প্রভাতকাকা পাঞ্জাবির ভেতর পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করলেন, এই দ্যাখ। নোট দ্যাখ আর দাঁত দ্যাখ।

সামনের দুটো বড় দাঁত বের করে নোটের গোছাটা চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললেন—তবু বলবি আমি আর প্রভাত এক? গদাইদা হার স্বীকার করে বললে, আমি আর প্রভাত, এক না বটেক।

—তাই বল। প্রভাত কাকা নোটের গোছা থেকে কিছু নোট নিজের পকেটে রেখে পিসিমাকে ডাকলেন, ছোড়দি এদিকে আসুন। পিসিমা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলেন। বাকি নোটগুলো এগিয়ে দিয়ে প্রভাত কাকা বললেন—আপনার কাছে রাখুন। একটাও যেন না হারায়। হারলেই পুলিসে দোব। পিসিমা নোটগুলো হাতে ধরেছেন। বেশ দেখতে পাচ্ছি হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। মুখটা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। পিসিমা বললেন—ও প্রভাত এতগুলো কোথায় রাখব? আমার যে কিছুই নেই।

কিছু নেই বলেই তো কিছু এসেছে। সব হারালেই তো সব পাওয়া যায়। প্রথমে টাকা ধরতে শিখুন, তারপর গুনতে শিখুন, তারপর রাখতে শিখুন, তারপর খরচ করতে শিখুন, তারপর শিখবেন ওড়াতে। নিন গুনুন তো, ক'টাকা আছে।

—প্রভাত এগুলো সব বড় নোট।

—হ্যাঁ বড় বটে কিন্তু কত বড়।

মুখ্যু মানুষ প্রভাত। অত যে বুঝিনা।

জ্যাঠাইমা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—নোট চেননা কি হা-ঘরে মেয়ে মানুষ? ওগুলো সব দশ টাকার নোট। এত টাকা কোত্থেকে পেলে প্রভাত ঠাকুরপো?

—ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। আজ আমি মদ খাব, মাংস খাব। ওরে আমি মদ খাব, মাংস খাব।

পিসিমা ভয়ে ভয়ে বললেন না প্রভাত, সব খাও, ওই মদটি খেওনা প্রভাত।

জ্যাঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মাতাল দেখে দেখে ঠাকুরঝির-ভয় হয়ে গেছে। প্রভাত কাকা গান গেয়ে উঠলেন—পিলে, পিলে হরি নামকা পেয়ালা। একবার করে পিলে বলছেন, এক ধাপ সিঁড়ি নামছেন, বাঁকের মুখে চওড়া সিঁড়িতে নেমে দু'হাত তুলে বললেন, হরি নামকা পেয়ালা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—তুলে রাখুন, গোলাপ ফুল মার্কা স্যুটকেসে—মানি মানি মানি, সুইটার দ্যান হানি। মানি মানি মানি, সুইটার দ্যান হানি।

বেলা পড়ে আসছে ধীরে ধীরে। উত্তর দিকের বাগানে নিমগাছের ঝিরি ঝিরি পাতায় হালকা হলুদ রঙের মরামরা রোদ দিনের শেষ খেলায় মাতামাতি করছে। দুটো শালিক কর্কশ গলায় সারাদিনের হিসেব নিকাশ নিচ্ছে। একটু একটু উত্তরের হাওয়া দেখা দিয়েছে। পুজো আসছে, পুজো আসছে।

উত্তরদিকের শেষ ঘরটা আমাদের খাবার ঘর, বাইরেটায় রান্নার ব্যবস্থা। দেয়ালের গায়ে বড় বড় দুটো উনুন পাতা। এক সময় সুখের দিনে দুটো উনুনেই গনগন করত আগুন। সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে একটায় আমার মা, জ্যাঠামশাই আদর করে বলতেন তুলসী মায়া, আর একটায় আমার রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশায় আদর করে বলতেন চপলা দেবী। উনুনের পেছনের দেয়ালে বহু বছরের ধোঁয়ার কালো কলি লেপ্টে আছে। কলির দাগ আর স্মৃতি যেন এক জিনিস। এখন একটা উনুনেই যথেষ্ট। আর একটায় যত খালি ঠোঙা, শালপাতা, ঘুঁটের টুকরো ঢোকান। উনুনের ডানদিকে কালো কুচকুচে বার্মা কাঠের দরজা। দরজায় শিকল তোলা। দরজা খুললেই মাঝারী মাপের একটা ঘর।

সারা ঘরের দেয়ালে নোনা লেগে পলস্তরা ঝরে নানা দেশের ম্যাপ তৈরি হয়েছে। দক্ষিণের দেয়ালে গভীর একটা কুলুঙ্গি। এত গভীর, সময় সময় মনে হয়, ওর পেছনে কোথাও কোন গুপ্ত ঘরে যাবার গোপন সিঁড়ি আছে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলেই দক্ষিণের ঘরটা যেন রেলের প্ল্যাটফর্ম। উত্তর দিকের দরজা দুটো হাহা করছে খোলা। দক্ষিণের দরজা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। যে যেখানে পেরেছে চিত হয়ে কাত হয়ে দিবা নিদ্রা দিচ্ছে। পূবের দেয়ালে ছবিতে জেগে আছেন রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমা, সিংহাসনের মত চেয়ারে সাদা বেনারসী পরে মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। পায়ে সাদা ডোরাকাটা পাম্পশু। পেছনে শ্বেতপাথরের থামওলা বারান্দা। বাইরে দুটো ঝাপসা গাছ। সাঁকোর তলা দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা নদী, সুদূর সিপিয়া রঙের আকাশে। জ্যাঠাইমা যেন রাজরাণী। এই ঘরের সব চেয়ে বড় ছবি জ্যাঠাইমার। ছবিটা এত, জীবন্ত মনে হয় এখুনি উঠে দাঁড়িয়ে, ভর্তি এক গেলাস দুধ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন—বিন্টু লক্ষ্মী ছেলে, খেয়ে নাও তো বাবা। দুধ না খেলে গায়ে শক্তি হবে কি করে। ফুটবলে এমন এক শট মারবে, বলটা সোজা আকাশে উঠে গিয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে সিধে গোলে। এক এক শটে এক এক গোল! আমি কি চাই আমার রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমা ঠিক বুঝতেন—এক এক শটে একটা করে গোল, এক মারে ওভার বাউন্ডারি। জ্যাঠামশাই কিনে দিয়েছিলেন এয়ারগান। জ্যাঠাইমা জানতেন এয়ারগান নয় আমি চাই ছোকনদার মত বড় বন্দুক। ডিসেম্বর মাসের সকাল থেকেই আমাদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে পশ্চিমে থানার দিকে বন্দুক ধারীদের মিছিল চলত, একদিন, দু'দিন, তিনদিন। একনলা, দোনলা বন্দুক, কোনটা চামড়ার খাপে ভরা কোনটা খোলা। ওই সময়টা দক্ষিণের জানলার ধারের বেনচি থেকে এক মুহূর্তের

জন্যে সরে যেতে পারতুম না। যেন উৎসবের কল! জ্যাঠাইমা বলতেন দুধ খাও, ইয়া গ্যাট্টাগোট্টা শরীর কর, আমি তোমাকে বড় বন্দুক কিনে দেব। কাঁধে স্ট্রাপ বাঁধা বন্দুক, পিঠে হ্যাভারস্যাক, মাথায় শোলার হ্যাট, পায়ে হান্টারবুট, আরাকানের জঙ্গলে যাবে বাঘ শিকারে।

—জানি, জানি তুমি কি কম চালাক ছিলে! জীবনের সব বড় বড় দিকের লোভ দেখিয়ে কখন খেলোয়াড়, কখন ঘোড়সওয়ার, কখন শিকারী, কখন বৈমানিক, কখন শিল্পী করার স্বপ্ন দেখিয়ে তুমি আমাকে দুধ খাওয়াতে, সহবত শেখাতে, নিয়ম মত সন্ধ্যার উপাসনা করাতে, গলা সাধাতে, হাতের লেখা করাতে, অঙ্ক কসাতে। এক জগতের স্বপ্ন দেখিয়ে, আর এক জগতে ফেলে রেখে, তুমি অন্য জগতে চলে গেলে। তুলসী মা কার ভরসায় আমাকে রেখে গিয়েছিল। এই পপাত ধরণীতলে এখনকার জ্যাঠাইমার ভরসায় নয় নিশ্চয়।

রান্না ঘরে পূবের জানালার পৈঠেতে বেশ কিছুক্ষণ পা তুলে বসে রইলুম। পাশের মাঠের খোঁটায় বাঁধা একটা কালো গরু আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে খাস বাগানের দিকে। ইংরেজ আমলে গঙ্গা থেকে একটা খাল কেটে পূর্ব বাঙলায় নিয়ে যাবার কথা ছিল। সেই সময় সরকার সমস্ত জমি খাস করে নিয়েছিলেন। খাল আর হল না। হলে কেমন মজা হত। ওই মাঠটা তখন চলে যেত খালের ধারে।

সারাটা দুপুর কেমন একটা খাই খাই ভাব। স্কুলে থাকলে অতটা বোঝা যায় না। গরুটা ঘাস ছিঁড়ছে। এখানে বসে বসেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। বেশ খাদ্য-খাদ্য ভাব। নিজের পেটটাই যেন কেমন ভরে উঠছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে দুর্গার' ঘুড়িটা' তারে জড়িয়ে আছে। কালও গোটা ছিল। আজ একদম ফর্দাফাঁই। হাওয়ায় ওলট পালট খাচ্ছে। ঘুড়ির ছায়াটা ভূতের মত হাত-পা-নাড়ছে উল্টোদিকের হলদে বাড়িটার দেয়ালে। দুটো চড়াই পাখি বাগানে ধুলোয় গববু করে খুব চান করছে। কড়িকাঠের ফাঁকে একটা চড়াইয়ের বাচ্ছা অনেকক্ষণ ধরে সিঁসিঁ করছে। লম্বা টেবিলের ওপর শালপাতায় মোড়া একটু তেঁতুল রয়েছে। একটা বিচি ছিঁড়ে নিয়ে নুন মাখিয়ে মুখে দিলুম।

এবার একবার দক্ষিণের বারান্দায় যাই। এদিকটা, গ্রাম ওদিকটা শহর। বড় রাস্তা ওদিকেই। এবার ওদিকের বেনচিতে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে আর কিছুক্ষণ বসি। এই সময় ভীষণ খিদে পায়। গদাইদা সেই কখন গেছে কেরেসিনের জন্যে লাইন দিতে। প্রায় মাইলখানেক দূরে শ্মশানের কাছে কন্ট্রোলে তেল দেবার দোকান; মালাদি পাশ ফিরে খুব ঘুমচ্ছে। মালাদির মাথায় বিনা পয়সায় অনেক খাবারের প্ল্যান আসে। জ্যাঠাইমারও আসে। তবে জ্যাঠাইমাকে হুকুম চলবে না। ইচ্ছে হলে, তবেই হবে।

রাজেনবাবুর দোকান খুলেছে। বালতি থেকে জল নিয়ে মগে করে রাস্তায়

ছিটচ্ছেন। সন্তোষদার দোকানে মামা নামের লোকটা দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে। সেই বিশ্রী মোটামত বিধবা মেয়েছেলেটি খাটো করে কাপড় পরে হাতে একটা পেতলের ঘটি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মামা এনামেলের একটা গেলাস বাড়িয়ে ধরেছেন। মেয়েছেলেটি চা ঢেলে দিচ্ছে। সবাই এই মেয়েছেলেটিকে মামার মেম বলে।

ফর্সা মত একটি ছেলে রাজেনবাবুকে মামলেটের অর্ডার দিয়েছে। সামনের বেনচিতে বসে ঘুগনি খাচ্ছে। প্যানে মামলেটটা হলদে হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝখানটায় পেঁয়াজ ও লঙ্কার ডুমো। একটু কাঁচা থাকতেই এপাশ ওপাশ থেকে ভাঁজ করে ডিশে তুলে ফেললেন। চায়ের বড় কেটলিটা উনুনে বসে গেল।

বাড়ির পশ্চিমে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। সূর্য যত গঙ্গার দিকে হেলতে থাকে, ল্যাম্পপোস্টের ছায়াটা ততই এগিয়ে আসতে থাকে আমাদের বাড়ির দিকে। এগতে এগতে আরো কিছু দূরে কলতলা পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর হঠাৎ উঠে চলে যায়। এইটাই আমার সূর্য-ঘড়ি। এই ছায়া দেখে সময় বুঝতে পারি। দিন চলে গেলে, দুঃখ নামে। আবার একটা আশাও হয়। রাতের খাবার সময়টা এগিয়ে আসছে। রুটি কম তেলের কুমড়োর ঘ্যাঁট। সাড়ে নটা কি দশটার মধ্যে বাবা ফিরবেন। অফিসের পর বেলগাছিয়ার ছেলে পড়ানো নিয়েছেন। বাবার ফেরার সময়টাও জানা আছে। গবা তেলে ভাজার দোকানের সামনে বসে হামানদিস্তেতে গরম মশলা পিটতে থাকলেই আমার সাবধান হবার সময়। এইবার বাবা আসবেন। গোড়ালির শব্দ শোনা যাবে কলতলার কাছে এলেই। জুতোর শব্দ অনেকেরই হয় কিন্তু বাবার জুতোর শব্দটা এতই পৃথক চিনতে কখনও ভুল হয়না। আমার কানে বোধহয় কুকুর আছে। আমাদের সেই সাদা কুকুর জিমের প্রেতাত্মা। হাউন্ড। কোন এক সাহেব জ্যাঠামশাইকে দিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাইয়ের অসুখ যখন খুব বাড়াবাড়ি সেই সময় কুকুকরটার বড় অযত্ন হল। নিচের স্যাঁতস্যোঁতে অন্ধকার গলিতে, দিনরাত বাঁধা থাকত। ঠিক সময় খাবার পেত না। না পেলে ডাকতো না। কত লোক, ওপর নিচ করছে, ডাক্তার বদ্যি, আত্মীয়স্বজন, পাড়ার প্রতিবেশী। জিম বুঝতো বাড়িতে বিপদ চলেছে। উৎসুক মুখে সকলের মুখের দিকে তাকাতো, যেন খবর নিতে চায়—কি দেখলে, কি বুঝলে। জ্যাঠামশাইয়ের খাট টা যখন বাড়ি থেকে সকলের কাঁধে চেপে বেরিয়ে গেল জিম উঠে দাঁড়াল, পা কাঁপছে। ন্যাজাটা শেষবারের মত প্রভুকে বিদায় জানাবার জন্যে বার কতক অতিকষ্টে নাড়ল। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকার জানলার দিকে মুখ করে সেই যে শুল আর উঠল না। বাবা ডাকতেন জিম। চোখ তুলে তাকাত। দু'চোখে অনবরত জলের ধারা। বামুনদি খাবার দিয়ে আসত স্পর্শ করত না। তিনদিন পরে ভোর বেলা বামুনদি এসে খবর দিল, জিম কখন মারা গেছে।

দূরে গদাইদা আসছে। বটতলা বরাবর এসেছে। হাতে তেলের টিন। মুখটা

রোদে পুড়ে আরও কালো হয়ে গেছে। গায়ে প্রভাত কাকার কিনে দেওয়া নীল রঙের একটা জামা, পায়ে ডোঙা মত টায়ারের চটি। গদাইদার সামনে বুক ফুলিয়ে আসছে কালো মত সেই মেয়েটি। বাড়ি বাড়ি কাজ করে। প্রভাত কাকা নাম রেখেছেন ভীমা। ও নাকি কুস্তির পালোয়ান। মুনসীদের বাড়ি দারোয়ান নাগেশ্বরকেও প্যাঁচ মেরে পটকে দিতে পারে।

ল্যাম্পপোস্টের ছায়াটা গদাইদাকে ধরার জন্যে যেন আরো কিছুটা এগিয়ে গেছে। তিনটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে। ছায়া দেখে মনে হচ্ছে চারটেও বেজে গেছে। কলে জল এসেছে। তেলের টিনটা কলের সমানে সুবোধের বাতাসার দোকানের রকে রেখে গদাইদা হাঁ করে কিছুক্ষণ দোকানটার দিকে তাকিয়ে রইল। সামনেই সুবোধের বড় রামছাগলটা চোখ বুজিয়ে লম্বাদাড়ি নেড়ে নেড়ে জাবর কাটছে। দু'জন কারিগর চ্যাটাইয়ের ওপর ঝুকে পড়ে টপা টপ বাতাসা পেড়ে যাচ্ছে। আমি জানি গদাইদা কি দেখছে। সামনেই কাঁচের জানলাঅলা চৌকো চৌকো কৌটোয় সাদা সাদা নকুলদানা আছে, সাদা বাতাসা আছে, আর আছে এত বড় বড় ফুল বাতাসা। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায়। গদাইদা বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কলে মুখ দিয়ে চোঁ চোঁ করে জল খেল। জামাটা তুলে মুখ মুছল। তারপর টিনটা তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে আসতে লাগল। আর ঠিক সেই সময় কিশোরী গঙ্গার দিক থেকে তার বিশাল পাটনাই গরুটাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে বেরিয়েছে। সঙ্গে কিশোরীর ফুলো ফুলো গাল বাচ্চা ছেলেটা যেন নেচে নেচে চলেছে। তার বগলে একটা খড়ের গরু। কিশোরীর হাতে দড়ি আর বালতি। হন-হন করে পশ্চিম দিকে হেঁটে চলেছে ডাকপিওন। গদাইদা ডেকে জিজ্ঞেস করল চিঠি আছে বটেক। লোকটি চলতে চলতেই বললেন—নম্বর কত ? সাতান্ন বটেক। পিওন ঘাড় নেড়ে, চলতে শুরু করল। বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সন্তোষদার দোকানে একটা খাম ছুঁড়ে দিল। খামটা মামার মুখে লেগে কোলের কুলোটার ওপর পড়ল।

তেলের টিন হাতে ক্লান্ত, শ্রান্ত গদাইদা সদরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। ট্যাং করে টিনটা একপাশে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যেন বিশ্ব বিজয় ক'রে ফিরেছে। আমি এক নবাব ঠ্যাং ছড়িয়ে আরাম করে বিশ্ব দর্শন করছি। সংসারের জন্যে আমার কিছু করার নেই! ছাদের টবে, বাবার সবচেয়ে দামী চন্দ্রমল্লিকার মত, সার নিয়ে, পরিচর্যা নিয়ে, বেড়ে উঠে সবচেয়ে বড় একটি চন্দ্রমল্লিকা ফোটাতে হবে। কড়া নির্দেশ-মা মরা ছেলে, দোকান নয়, বাজার নয়, রেশানের লাইনে নয়, কোথাও নয়, তুমি থাকবে পড়ার টেবিলে বই মুখে। তুমি ওরই মধ্যে ভাগ্যবান, তোমার পিতা এখনও জীবিত। আশ্রিতের সংখ্যাও অনেক। তোমার পিতা যোগাবেন অর্থ, ওরা দেবে শ্রম। তুমি শুধু বাঁচবার চেষ্টা কর, বড় হবার চেষ্টা কর।

গদাইদা বেঞ্চির আর এক মাথায় রাস্তার দিকে মুখ করে বসল। আগের চেয়ে অনেক চটপটে হয়েছে। রাস্তাঘাটে চিনেছে। বুঝতে পেরেছে, কোন জমিতে দাঁড়িয়ে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। আগের মত কথায় কথায় রেগে যায় না, বোনের সঙ্গে ঝগড়া করে না। মার ওপর অভিমান করে না।

নিজের কিছু না করার লজ্জা চাপা দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করলুম তোমার বুঝি চিঠি আসার কথা? গদাইদা বললে—হুঁটোদা বলেছিল হেডমাস্টার মশাইকে বলে ট্র্যানসফার সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবে। তা মাইনে বাকি আছে বটেক।

—তুমি স্কুলে কবে ভর্তি হবে গদাইদা? আমাদের স্কুলেই ভর্তি হয়ে যাওনা।

গদাইদার মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। প্রবীণ মানুষের মত উত্তর দিল—তোমাদের স্কুলে মাইনে লাগবে যে? ছোটমামা বলেছেন দু'বেলা দুটো খাওয়া জুটেছে এইনা কত? এর ওপর পড়ার খরচ? একটা ফ্রী স্কুল যোগাড় করতে হবে।

—কোথায় পাবে?

—আছে বটেক। সেই তিন মাইল দূরে গোপেশ্বর স্কুল। মা বলেছে অধীরবাবুকে ধরবে।

দু'জনেই জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। একটা ছাগল ইয়া বড় পেট নিয়ে আপন মনে চলেছে। দূরে ঘুঙুর বাজিয়ে সঙের মত পোশাক পরে হারিদাসের বুলবুল ভাজা আসছে। যত খাবে ততই মজা। গদাইদা পকেট হাতড়ে একটা আনি বের করল। পয়সাটা তালুর ওপর রেখে আমাকে দেখিয়ে বললে তেলের পয়স থেকে এইটা ফিরেছে. আমরা দু'জনেই আনিটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। বুলবুল ভাজা নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। কারুরই সাহস হলনা তাকে ডাকি। গদাইদা আঙুল দিয়ে পয়সাটা নাড়তে নাড়তে বললে—গরম গরম বাতাসা তৈরি হচ্ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ভুজাওলার দোকানে ছোলাসেদ্ধ হয়েছে। লাল লাল কাঁচালঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। বহু রকমের খাবার চোখের সামনে ভাসছে। এই তো এখান থেকেই তিন রকম দেখতে পাচ্ছি। সন্তোষদার দোকানের সামনে জারে সাজান—গোল গোল নানখাতাই, তিনকোণা লেড়ো, কিশমিশ আর কুমড়োর বরফি গোঁজা নরম নরম কেক। উপায় নেই, হিসেবের কড়ি। বাঘেও ছোঁবে না।

এক সময় ছিল যখন এই জানলা থেকে একটা আঙুল তুললেই সন্তোষদার দোকান থেকে লজেনস আর বিস্কুট ওপরে চলে আসত, হাতের মুঠোয়,। সে সব সুখের দিন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। ধারে কিছু চলবেনা। সব নগদের কারবার। তিন বছর আগেও বিকেলের জলখাবার ছিল ভাদুয়া ঘিয়ের ফুলকো লুচি, মুচমুচে আলু ভাজা। শুকনো লঙ্কার ভাজা দানা, কি সুন্দর লাগত দাঁতে কাটতে।

মালাদি ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মুখটা ফুলোফুলো লাগছে। রাস্তাটা একবার দেখে নিয়ে বললে—দেখেছিস? দু'জনেই অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালুম—

কি গো মালাদি?

—আবার কচি কচি পেয়ারা হয়েছে ?

বাগানে পাঁচিলের গায়ে দো-ফলা পেয়ারা হয়েছে, শীতের পেয়ারা সবে ফুলকচি হয়েছে সে তো পাকবে অনেক পরে। এখন ওনিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। এখন একবারে কষা-বিস্বাদ।

—পেয়ারার আচার খাবি বিল্টু? বেশ ঝাল ঝাল নুন নুন।

—কি করে করবে ?

—দেখনা ঠিক করব। চল্ ওদিকে চল্ হাতে হাতে কয়েকটা পাড়ি চল্।

যত বিকেল হতে থাকে উত্তর দিকটা তত বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হয়ে আসে। ছোট্ট একফালি জায়গায় যত রকমের গাছ। পেয়ারা গাছটা এতই বেয়াদব, বেশিরভাগ ডালপালা পূবের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পাঁচিলের ওপাশেই একটা টিনের ঘর। বস্তি বাড়ি মত। সমস্ত ভাল ভাল পেয়ারাওলা ডালের গতি সেই দিকে। দু-একটা ডাল আমাদের বারান্দার টিনের চালে এসে ঠেকেছে। হাত বাড়িয়ে টানাটানি করলে গাছের পূবের অংশের কিছুটা নাগালের মধ্যে আসে।

মালাদি একটা ডাল ধরে বললে, টান বিল্টু। দু'জনে টানতেই ওপাশের কিছু ডালপালা আমাদের দিকে এগিয়ে এল। মালাদি বললে, গদা তুই আর বিল্টু এইবার এইটা টেনে ধর, আমি আরো কিছু ওপাশ থেকে ধরে আনি। বারান্দার কাঠের রেলিংয়ের ওপর উঠে হাত বাড়িয়ে মালাদি আরো আরো দূরের ডাল ধরে আনার জন্যে শরীরের ওপরের অংশটাকে শূন্যের দিকে তুলে রয়েছে। মুখে চোখে ঘাড়ে সর্বত্র পেয়ারা পাতা আর ডাল। মালাদি কেবলই সাবধান করছে। দেখিস ভাই, ছাড়িস না ভাই।

মনের মত পেয়ারাওলা ডালটা অনেক কষ্টে নাগালে এল। সেই ডালটা অনেক দূরের ডাল, তবু আমরা ধরে ফেলেছি। বাকি ডালগুলো ছেড়ে দিতেই টিনের চালে বিকট একটা শব্দ করে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল। যাবার আগে দারুণ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে চোখে মাথায় ডাল পাতায় ঘষা দিয়ে গেল। পেয়ারা পাতার গন্ধ ভারি সুন্দর। মনে হল সন্ধ্যে আসছে, আকাশে বাদুড় উড়ছে, ঝোপে ঝোপে, লাল সাদা, ছিটছিট কেষ্ট কলি ফুল আসছে।

মালাদি তাড়া লাগল—তোরা কোন কম্মের নোস, ঠিক করে ধর। চটপট ছিঁড়েনি। ডালটা ভীষণ টানাটানি করছে যে মালাদি।

—ধরে থাক। ও তো পালাবার তালেই আছে। ধর টেনে।

বেশ কিছু ফুলকচি পেয়ারা আমরা শিকার করেছি। মালাদি ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল—নে ছেড়ে দে। যেই না ডালটা ছেড়েছি সেটা বিদ্যুৎ বেগে প্রচন্ড একটা শব্দ করে টিনের চালের ভেতর দিকে লেগে তার সমস্ত সঙ্গী সাথী নিয়ে যথাস্থানে ফিরে গেল। আমরা শব্দ শুনে ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

ভেবেছিলুম চালটাই বোধহয় উড়ে গেছে। না সেরকম কিছু হয়নি। তবে সেই প্রকাণ্ড হনুমান লাফিয়ে পড়ার মত শব্দ শুনে জ্যাঠাইমা দৌড়ে এলেন।

—একি অত্যাচার অ্যাঁ, এই কচি কচি পেয়ারাগুলো তোরা পাড়লি কেন? দাঁড়া ঠাকুরপো আসুক, সব বলে দোব। গদাই একবার তুই দোতলা থেকে পড়ে মাথাটা তাল তোবড়া করেছিস, এখনও শিক্ষা হলনা।

জ্যাঠাইমার তিরস্কার শেষ হতে না হতেই, বস্তি বাড়ির সেই মোটা মত মহিলাটি খোলা দাওয়ায় বেরিয়ে চিৎকার করে উঠল—কোন মুখপোড়ারে? টিনের চালটা ভাঙছে। মহিলা ভেবেছে শব্দটা তার চালে হয়েছে। জ্যাঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে কাঠের রেলিং দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন, বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখ? টিনের চাল কি এ তল্লাটে তোমার একলার আছে? আমাদেরও আছে। সারা বছর পেয়ারা পেড়ে ফাঁক করে দিলে, তেড়ে এসেছে ঝগড়া করতে।

বাঁজা শব্দটার মানে জানিনা, কিন্তু জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত কাজ হল। মহিলা অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরে। এই মহিলা সেদিন দুপুরে বিনা কারণে আমাকে ভীষণ লজ্জা দিয়েছিল। খোলা দাওয়ায় বসেছিল হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে.আর ওর স্বামী একটা দিকের কাপড় একেবারে সরিয়ে দিয়ে উরুতের ঘামাচি মেরে দিচ্ছিল আধশোয়া হয়ে? আমি ওসব দেখিও নি, দেখতেও.যাই নি। ডুমুর গাছে পেছন ফুটো একটা কলসি বেঁধে রেখেছিলাম পাখি বাসা করবে বলে, দোয়েলের আনাগোনা শুরু হয়েছে। খুব শিষ দিচ্ছিল। দেখতে গিয়েছিলাম বাচ্ছা হয়েছে কিনা। মহিলা বেশ শোনা যায় এমন গলায় বলল ছোঁড়াটার এই বয়েসেই পিপুল পেকেছে। চট করে সরে এসেছিলুম। কথাটা বড়দের কাউকে বলিনি।

মহিলাকে ঠান্ডা করে জ্যাঠাইমার মেজাজটাও যেন একটু সদয় হল। আমাদের বললেন—বেশ করেছিস। সব কটা পেড়ে নিলেই পারতিস। ওই মাগীটার জন্যে একটাও পাকা পেয়ারা খাবার উপায় নেই।

মালাদি বললে—খাবে মাইমা?

—থুর ওই কোষো পেয়ারা মানুষে খায়? এখনও অতটা দুর্ভিক্ষ হয়নি রে?

—না না, আচার কোরবো তো?

—এর আবার আচার কিরে, বাঁকুড়ার পেত্নী?

—দেখই না, একদিন খেয়ে। কি রকম ঝাল খাবি বিন্টু?

—তুমি যে রকম দেবে?

—তা হলে একটু ঝাল ঝালই করি।

বারান্দায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে শেষ বেলায় পেয়ারার আচার দারুণ জমল। গদাইদা খেতে খেতে বললে - তুই এটা বেশ ভালই করিস বটেক?

জিভটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। পাতাগুলো বাগানে ফেলে দেওয়া হল। উড়ে উড়ে লাট খেতে খেতে এক একটা এক এক জায়গায় পড়ল। মালাদি বললে, আয়

এবার জিভ বের করে বারান্দা দিয়ে বাগানের দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়াই যত নাল পড়বে তত ঝাল কেটে যাবে,

ওদিকে সূর্য ডুবছে, ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে, এদিকে আমরা তিনজন কুকুরের মত জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছি। চোখ, নাক, জিভ সব দিক দিয়ে টপটপ করে জল বেরুচ্ছে? এক সময় মালাদি বললে—নে, সব জিভ তুলে নে। আমরা যেন জিভের কাপড় জল ঝরার জন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। যার যার জিভ তার তার মুখে পুরে নিয়ে শুরু হল রাত্রির প্রস্তুতি।

মালাদি বললে সবই হল, একটুর জন্যে জিনিসটা তেমন হলনা?

গদাইদা বললে—কিরে দিদি?

—একটু কলাপাতা? কচি কলাপাতায় রেখে এসব জিনিস খেতে হয়। ঠিক আছে আর একদিন আমরা কলাপাতায় খাব।

মেয়েরা সব মেয়ে মহলে চলে গেল। উনুনে আগুন পড়েছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির কাছ থেকে রান্না ঘর, এই হল মেয়ে মহলের সীমানা। বাবা বাড়ি ফিরলে সীমানা আরও ছোট হয়ে, শুধু রান্না ঘর টুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্ধকার ক্রমশই গ্রাস করতে আসছে। নিচেটা একে বারেই অচেনা লাগছে। কুয়োতলা, শ্যাওলা ধরা উঠান। উঠান মুখো সিঁড়ি ঘর। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার গলিপথ। দু'পাশে সারি সারি বন্ধ ঘর। ভাঙাচোরা মালপত্রে ঠাসা আরসোলা, ইদুঁর, ছুঁচো বড় বড় বিছে, সাপও আছে। মাঝে মাঝে ওপরে বেড়াতে আসে। রাতের বেলায় রান্নাঘরের একপাশের দেয়ালটা তো আরসোলায় লাল হয়ে থাকে। আর আছে অশরীরী প্রেতাত্মা। বামুনদি তো প্রায়ই দেখতে পেত। এই দক্ষিণের ঘরেই সে বহুবার জ্যাঠামশাইকে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখছে। মাকে দেখেছে, ছাদের আলসের ধারের চুল এলো করে দাঁড়িয়ে থাকতে। রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমাকে দেখেছে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে।

সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বাড়িটা যেন কেমন। ভয় ভয় অন্ধকার অন্ধকার। একটা আলো জ্বলছে ওই মাথায় উত্তর মহলের মেয়ে পাড়ার রান্না ঘরে। আর একটা জ্বলছে দক্ষিণের ঘরে, ছাত্র মহলে। মেঝেতে মাদুর পেতে আমি আর গদাইদা মুখোমুখি বসেছি। মাঝখানে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। কন্ট্রোলে লাল তেল দিয়েছে। শিখাটা ময়লা। গদাইদাকে কায়দা করে উত্তর দিকটায় বসিয়েছি। পেছনেই খোলা জানলা, বারান্দা, বাগান, ঝুপসি গাছপালা। কোন বাধা নেই। বসলেই পিঠের দিকটা কেমন সুড় সুড় করে! আমার পেছন দিকে দেয়াল। একটা বই ঠাসা বহুকালের আলমারি। পাশেই বড় জানলা। জানলার ওপাশ দিয়ে সদরের অন্ধকার সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে, জনমানব শূন্য একতলায়। এই সিঁড়িটাও ভয়ের। যে কেউ

চুপি চুপি উঠে এসে জানলায় চোখ রেখে দাঁড়াতে পারে। ভূত হলে লম্বা হাত বের করে আলোর পলতেটা কমিয়ে দিতে পারে।

গদাইদা সঙ্গে চুক্তিই হয়েছে, পড়তে পড়তে সে নজর রাখবে আমার পেছন দিকটায়, আমি নজর রাখার ওর পেছন দিকটায়। গদাইদা আমার ট্রান্সলেসান বইটা নিয়ে দুলে দুলে মুখস্থ করছে। আমি করেছি গ্রামার। রাত দশটার সময় বাবাকে পড়া দিতে হবে। ডিমিনিউটিভস বড় বড় নাউনকে ছোট করার কায়দা। মত্তিরদের বাড়ির বিশাল দুলাল কাকাকে ছোট করতে হলে একটি এট লাগাও। আইলেট, দুলালেট ডিমিনিউটিভস আর ফর্মড টু একস্প্রেস দি আইডিয়া অফ এনডিয়ারমেন্ট অর কন্টেম্পট দে আর অলসো অ্যাপ্লায়েড টু দি ইয়ং অফ লিভিং বিইংস অ্যান্ড টু থিঙ্গস বিলো দি অ্যাভরেজ সাইজ। এবার বাবার তৈরি করে দেওয়া সেই শ্লোকটায় কি কি লাগিয়ে করতে হবে ঃ এই, ইকিন কিন ওয়াই, ইয়ে স্ক, এট, লেট, ইউল, ক্লি, কিউল, লিং, অক।

যা হয়, বই খুললেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। মাথাটা প্রথমে সামনের দিকে ঝুলে যায়। লেখা ঝাপসা হতে থাকে একই বাক্য বারে বারে বলতে বলতে যেটা হতে থাকে ক্রমশ, শেষে একটা শব্দই ঘুম জড়ান জিভে জপের মন্ত্র হয়ে-ওঠে- লেট ইউল ক্লি, কিউল, ইউল, কিউল কিউল ঢুলে বাঁ দিকে পড়ে যাবার মত হল। াবার গোড়া থেকে এন ইকিন কিন। সামনে মাথা নামছে বেশ বুঝতে পারছি জকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। ক্লি কিউল ইউল কিউল ডান দিকে পড়ে যাবার মত হল। আবার সোজা হয়ে এন ইকিন কিন........

উল্টোদিকে গদাইদা গুম হয়ে বসে আছে। একটু আগেই বারে বারে পড়ছিল- ইজ অ্যাম আর-এর পর ভার্বে আই এন জি। ঘুম জড়ানো লাল চোখে একবার তাকিয়ে দেখলুম। আলোর ছায়ায় গুম গম্ভীর মুখ। চোখ দুটো বোজান। কিছু ভাবছে বোধহয়। মনোযোগী পড়ুয়া, পড়ছে আর ভাবছে। কালকেই বাবা গদাইদার খুব প্রশংসা করেছেন। চৌবাচ্চার যে অঙ্কটা আমি কিছুতেই পারছিলুম না, গদাইদা খাতা ধরেই করে দিয়েছিল। একটা নল দিয়ে জল ঢুকে ছ'ঘন্টায় পূর্ণ করে, আর একটা নল দিয়ে জল বেরিয়ে সাত ঘন্টায় খালি করে। দুটো নলই একসঙ্গে খোলা থাকলে কখন পূর্ণ হবে? এরকম বেয়াড়া চৌবাচ্চা অঙ্ক বইয়েতেই থাকে। আমাদের নিচের চৌব্বাচাটার একটাই নল। জল বেরিয়ে যাবার ছোট্ট একটা ছেঁদা আছে। সেটা বন্ধই থাকে। বাবা বলেছিলেন, পড়াতে হলে এই সব ছেলেদেরই পড়ানো উচিত। তোমার পেছনে শুধু ভস্মে ঘি ঢালা। সেই থেকে গদাইদার ডাটটা একটু যেন বেড়ে গেছে। আজ রাতে সেই হতচ্ছাড়া শামুকটা আসবে যার কাজই হল একটা বাঁশ বেয়ে রাতের বেলা ওপর দিকে ওঠা আর দিনের বেলায় নিচে নেমে আসা। সেই ওঠানামার খেলা দেখে হিসেব করে বল, তিনি কখন টঙে চড়ে বসবেন। আর আছে সেই মারাত্মক ঘড়ি যার একটা কাঁটা খুলে পড়ে যাবে আর

একটা মাত্র কাঁটা ঘুরতে থাকবে, সেই দেখে বল কটা বাজল?

লেট ইউল ক্লি কিউল। বাকিটা আর বলতে হল না। গুম গদাইদা সটান পেছন দিকে উল্টে পড়ল। পা দুটো ছিলে ছেড়া ধনুকের মত ছিটকে হ্যারিকেনটাকে মাদুরের ওপর চিৎপাত করে দিল। ভাগ্যিস মুখটা ডান দিকে সরানো ছিল। আলোটা বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। তুলে বসাতে বসাতেই তিন চারবার দপদপ করে আয়ু শেষ। আমার গ্রামার বইটা ছিটকে চলে গেছে। ঘোর অন্ধকার। গদাইদা ঘুমোচ্ছিল, না ভূতে উল্টে ফেলে দিল বুঝতে পা পেরে, উঠে পালাতেও না পেরে রাম নাম জপতে লাগলুম। জবরদস্ত শব্দ হয়েছে।

কি হল রে, কি হোল রে বলে প্রথমে ছুটে এলেন পিসিমা, পেছনে নাক ফোঁস ফোঁস করতে করতে জ্যাঠাইমা। বারো মাস সর্দি যেন লেগেই আছে। কিছু ভেবে না পেয়ে আমি বললুম গদাইদার ভর হয়েছে।

—সে কি! মালা আলো নিয়ে আয়, আলোটা নিয়ে আয়, এই ছেলেটাই আমাকে মারবে রে। পিসিমার আর্তনাদ, মালাদি আলোটা এনেই চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ভাইকে দেখে বললে—এ কাকাবাবুর কাজ বটেক। বাণ মেরে দিয়েছে।

জ্যাঠাইমা ধমকে উঠলেন—তোর ছাগলীর বুদ্ধি। তোর কাকাবাবু রইল বাঁকুড়ায়, সেখান থেকে বাণ মেরে দিল এত লোক থাকতে তোর ভাইকে, হাঁসব না, কাঁদব।

—তুমি জাননা মাইমা, ওই মড়াটা সব পারে বটেক। আসার সময় বলেছিল, শত্তুরের শেষ রাখতে নাই, ছেলেকে দিয়ে বিষয়ের ভাগ নেবে।

—রাখ তো তোর কাকাবাবু। দাঁড়া ডেকে দেখি, গদাই ও গদাই।

গদাইদা সাড়া দেবার আগেই প্রভাত কাকার গলা পাওয়া গেল সিঁড়িতে। কলকাতা থেকে ফিরছেন। মুখে গান—অন্ধকারে অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে। দু'হাতে দুটো প্যাকেট। ঘরে ঢুকে বললেন—কি হয়েছে ছোড়দি?

—সর্বনাশ হয়ে গেছে প্রভাত। গদাইকে বাণ মেরেছে।

—কে মেরেছে? বাণটা কই বটেক।

—এ বাণ, সে বাণ নয়, মন্তরের বাণ!

—তাই নাকি? কই দেখি? তাহলে তো আমাকে বাণ কাটার বাণ ঝাড়তে হবে।

প্রভাত কাকার হাতে একটা বড় টর্চও ছিল। গদাইদার মুখে জোর-আলো ফেললেন। ও এতো দেখছি নেশা করেছে!

—কি নেশা প্রভাত?

—চণ্ডু, চরস, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেট। দেখছেন না মুখটা কিরকম কালো হয়ে আছে।

জ্যাঠাইমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কি যে বল প্রভাত ঠাকুরপো, বংশটাইতো কালোর বংশ। রঙ ছিল আমাদের বংশে। পিসিমা খেপে গিয়ে বললেন—নেশা! আমি ওকে ঝাঁটা পেটা করব। পিসিমার কথা শেষ হতে না হতেই, গদাইদা যে

ভাবে সোজা উল্টে পড়েছিল, ঠিক সেইভাবে সোজা উঠে বসে দুলে দুলে বলতে লাগল জিরান্ড, জিরান্ড। ভার্বে আই এন জি যোগ করিয়া পার্টিসিপ্যাল ও জিরান্ড হয়, জিরান্ড হয়।

প্রভাতকাকা বললেন—সকালে সরে যান, সরে যান। ওর ওপর নেসফিল্ড সাহেব ভর করেছেন। কোনো ভয় নেই।

—সে কি প্রভাত! পিসিমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—সে এক পন্ডিত সাহেব। যিনি ভর করলে অনিদ্রার রোগীরও নিদ্রা আসে।

ওদিকে অন্ধকার রান্নাঘরে বাবু চিৎকার করছে— ও মা আলো আন, আরশোলা উড়ছে।

ছেলের গলা শুনে জ্যাঠাইমা হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন— ওঃ, ঘুমের ছিরি দেখ। সবই কি অদ্ভুদ! আমাদের পড়ার আলোটা তখনও—নিভে আছে। ঘোর ঘন অন্ধকার। প্রভাত কাকা ডাকলেন—গদাই, ওরে ও গদাই।

—আজ্ঞে প্রভাত মামা।

—উঠে দাঁড়াতে পারবি? গদাইদা উঠে দাঁড়াল। - যা আলোটা রান্নাঘরে থেকে জ্বেলে আন।

আলো এল। প্রভাত কাকা প্যাকেট খুলে একটা গেঞ্জি বের করলেন, ঘি-রঙের গোল গলা হাফহাতা। নে তোর গেঞ্জি। পরে দেখ। গদাইদার শরীরটা অনেকটা কঙ্কালের মত। প্রভাত কাকা বললেন—হাড়ের এগজিবিশন হলে তুই ফার্স্ট প্রাইজ পাবি গদাই। তোর পাঁজরায় সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা খেলছে রে। গদাইদা লজ্জায় তাড়াতাড়ি গেঞ্জিটা পরে ফেলল। বুকের দিকে যেমন চওড়া, ঝুলের দিকে তেমনই ছোট। দু'পাশের দুটো পুট কনুইয়ের ওপরে এসে থেমেছে। হাত দুটো লপ টপ করছে।

প্রভাত কাকা বললেন—বাঃ বেশ হয়েছে। গদাইদা খুব খুশি —হ্যাঁ মামা বেঁশ য়েছে বটেক?

মালাদি বললে—ধ্যুর, এটা প্রভাত মামার গেঞ্জি। দেখছিস না। বুকটা কত বড়। প্রভাত কাকা বললেন—এটা হোল-ফ্যামিলির গেঞ্জি। বাবুর হবে, ছোড়দার হবে, ছোড়দির হবে, তোর হবে, আমার হবে, সকলের হবে। সেই কায়দায় কেনা। দেখছিস না ঝুলটা ছোট, বুকটা বড়। একে বলে ফ্যামিলি সাইজ। ছোড়দি একবার পরে দেখুন তো?

—না প্রভাত মেয়েছেলে কি গেঞ্জি পরে?

—খুব পরে। ব্লাউজের বদলে পরবেন।

পিসিমা পালাচ্ছিলেন। প্রভাতকাকা ধর-ধর করে টেনে নিয়ে এলেন। পরতেই হবে। পালাচ্ছেন কোথায়?

গেঞ্জি পরা পিসিমা আর দেখা হলনা। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। গবার হামানদিস্তের ঠকঠক শব্দ শুরু হবার আগেই বাবা আজ এসে পড়েছেন। কদাচিৎ এইরকম হয়ে থাকে। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে প্রায় একলাফে সিঁড়ির কাছে। হাত বাড়িয়ে ঝোল ব্যাগ আর ছাতাটা নিতে নিতে আমাদের রোজকার কুশল বিনিময়—বাবা কেমন আছেন ? ভাল আছি। তুই কেমন ? ভাল। মুখটা অসম্ভব গম্ভীর। ঝড়ের পূর্বাভাস পা থেকে ফিন ফিনে একপর্দা ধুলো মাখা, কালো ঝকঝকে নিউকাট খুলে ডানপায়ের দুটো আঙুল দিয়ে একসঙ্গে দুটো পাটিকে ধরে সশব্দে র‍্যাকে রাখলেন। পাশ থেকে এক পাটি চটি কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। গ্রাহ্য করলেন না। ঘরে ঢুকবেন দরজার সামনেই প্রভাত কাকা। তখনো সাজপোশাক ছাড়েননি। বাবা বললেন. প্রভাত যে। তুমিও ফিরলে। প্রভাত কাকা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবা অন্ধকার ঘরের চৌকাঠ ডিঙোতে ডিঙোতে বললেন-আজও ভুলেছ ? আজ্ঞে না। সব পেয়েছ ? আজ্ঞে হ্যাঁ। কাঁচি ? পেয়েছি। মুখটা সরু ? সরু। অ্যালুমিনিয়ামের চিরুনি ? পেয়েছি। লোহার তেপায়া ? পেয়েছি। চামড়া ? পেয়েছি। কাঁচা না পাকা ? পাকা। গুড, নাও জামা কাপড় ছাড়, না বেরবে আবার ? প্রভাত কাকা উত্তরে ফরর করে কাপড়ের কোচাটা খুলে বুঝিয়ে দিলেন, বেরবেন না।

বাবার সেই এক বেশ। লাল গামছা ও গেঞ্জি। পেটেটা অল্প একটু বেরিয়ে আছে। চওড়া বুকে কোঁচকানো কোঁচকানো চুল। চোখে রোল্ডগোল্ড চশমা। দক্ষিণের বারান্দার ফরাসী কায়দায় জানলা ঘেঁষা টেবিলে, দক্ষিণ মুখো চেয়ারে বাবা। সামনে চায়ের কাপ। ধোঁয়া উঠছে। হাতে নীল মলাটের সেই ইংরাজী বইটা। ঝোলায় ঘুরছে গত কয়েকদিন। পিরানদিল্লোর গল্প সংকলন। যেতে আসতে ট্রামে পড়েন। বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে একটু পড়েন। শেষ চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে বই মুড়ে আসে। পাশ থেকে বেরিয়ে থাকে ট্রামের টিকিট। মার্কা। পড়তে পড়তে নিজের মনেই বলে উঠলেন, বা বা। কী সুন্দর, কী সুন্দর!

বাঁ'পাশের চেয়ারে সারাদিনের হোমটাস্ক নিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি। রাত এগারোটায় সময় বাবা রায় দিলেন—লেখাপড়া আমার জন্যে নয়। আমার কিছুই নেই, কমনসেন্স নেই, ইনটেলিজেনসি নেই, অমনোযোগী, ফাঁকিবাজ। থাকার মধ্যে আছে ওপরচালাকি। যাও এখন শরীরটা ঠিক কর, খাও দাও, ফুর্তি কর। তবু পরে মোট বইতে, কি রিকসা চালাতে পারবে। মন খারাপ কোরনা। যা হবার নয় তা হবে কি করে। যাও ঝোলায় আম আছে। পিসিমাকে ভিজিয়ে দিতে বল। খেয়েদেয়ে মজাদার করে ঘুম লাগাও বাবা, যা বুঝি সেইটাই হবে কাজের কাজ।

দক্ষিণের বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া পুব ঘেঁষা বাথরুম। বাবা স্নান করছেন স্নানের সময় বিশেষ একটি সাবান ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করেন না। জুঁই ফুলের মত গন্ধ। স্নান করতে করতে ঠাকুরদের নাম হচ্ছে তার-স্বরে-প্রভু, প্রভু রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব. রক্ষ মাং, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহিমাং

প্রভু, প্রভু। যেই প্রভু বলে চিৎকার করছেন রাজেনবাবুর প্রায় বন্ধ দোকানের সামনে উচ্ছিষ্টের লোভে বসে-থাকা সাত-আটটা কুকুর বাড়ির দিকে মুখ তুলে কোরাসে ঘেঁউউ করে উঠছে।

রোজই ভাবি, এটা এক ধরনের অপমান। কুকুরগুলো বাবার অপমান করছে। কুকরদের তো আর শিক্ষিত করা যাবে না। তবে বাবা ঠাকুরদের নাম এমনভাবে করতে পারেন যাতে ওদের কানে না ঢোকে। সে কথা তো বাবাকে বলা যাবে না। বললেই ওনার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় হয়তো বলবেন—মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না। একপাল কুকুরকে জগাই মাধাই ভেবে বসবেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাবা আর প্রভাত কাকা দক্ষিণের টেবিলে বসেছেন। থানার পেটা ঘড়িতে বারটা বাজল। এ বাড়িতে বারটা রাত কিছুই না। চাঁদের আলোয় চারদিক ধুয়ে যাচ্ছে। কিছু দূরেই গঙ্গায় একটা স্টিমার ভিজে গলায়-ভোঁ করে উঠল। ঘরে ঘরে বিছানা পড়েছে। কেলে কেলে মশারি। একটু চাঁদের আলো মেঝেতে লুটিয়ে আছে। প্রভাত কাকা ভুঁড়ির ওপর দুটো হাত ভাঁজ করে পেছনে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বাবা বসে আছেন সোজা। কারুর মুখে কোন কথা নেই। বিশ্রামের আগের মুহূর্ত।

পিসিমা সিঁড়ি দিয়ে হ্যারিকেন হাতে নামছেন। বাবা একটু নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় চললি!—যাই ছোড়দা, দরজাটা দিয়ে আসি।—ও এখন সদর খোলা! এইবার একদিন সব যাবে। প্রভাতকাকা বললেন—কি আর নেবে! ঘরের অবস্থা দেখেছেন! চোর ঢুকলে বেরোতেও পারবে না। মশারির দড়িতে আটকে-মাটকে বসে থাকবে! বাবা কথাটা খুব পছন্দ করলেন—তা যা বলেছ। তবু সাবধানের মার নেই।

পিসিমা নিচে নেবে গেছেন। যেমন বাড়ি তেমনি তার সদর। বিশাল দরজা। বাঁ দিকের ছোট পাল্লা। ডানদিকেরটা বড় দুভাঁজ। দুটো পাল্লায় তেমন বনিবনা নেই। বন্ধ করলে বড়টা ছোট টার ওপর উঠে থাকে। খিলটা খোলা। দরজার মাপেই তার ওজন ও আয়তন। খিল লাগানোটাই আসল কেরামতি। যে কোন একপাশের হুকের খিলের একটা মাথা একটু ঢুকিয়ে দু-হাতে আপ্রাণ শক্তিতে চেপে ধরে, অসম অংশটার বুকের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় হুকের ওপর মাথাটা এমন কায়দায় গুঁজতে হবে, যাতে এ মাথাটা ঝড়াস করে ঢেঁকি কলের মত উঠে না পড়ে। মুখ, বুক, আর পা তিনটেকে বাঁচিয়ে দরজা বন্ধ করা। ঘুসি মেরে মেরে খিল নামাতে হবে। সে শব্দও সাংঘাতিক! এই কারণে সিংহ দরজা দিনে একবারই খোলা হয়, বন্ধ হয় মাঝরাতে।

হড়াস করে দরজা লাগাবার শব্দটা পাওয়া গেল। গুম গুম দু'চারটে ঘুষির শব্দও শোনা গেল। তারপরই খিল এবং পিসিমা এক সঙ্গে দু'জনের পতনের শব্দ। মাঝে মধ্যে খিলটা ছিটকে ওঠে বটে, আজকে খিলটা বোধ হয় বাগে পেয়ে

পিসিমাকে নক-আউট করে দিয়েছে। অনেক দিনের চেষ্টা সফল।

বাবা চিৎকার করলেন— কিরে মরেছিস! কোন উত্তর নেই। প্রভাত কাকার দিকে তাকিয়ে বললেন—শেষ। অপঘাতে মৃত্যু লেখা আছে বরাতে, কে ঠেকাবে। পালিয়ে এল দেওয়ের খাঁড়ার ভয়ে, মরল শেষে খিলের ঘায়ে। যাক মরে বেঁচেছে। চল সৎকারের ব্যবস্থা করি।

অন্ধকারে কেউ বুঝতে পারে নি। রঙে রঙ মিলিয়ে পিসিমা নিঃশব্দে ওঠে এসেছেন। প্রভাত কাকা বললেন—ওমা এ কি, মরেননি? তা মরেননি যখন উত্তর দেননি কেন? রসিকতা হচ্ছে। হতভম্ভ পিসিমার মুখে কোনো কথা নেই। সারা শরীর কাঁপছে। —কি হয়েছে ছোড়দি। কি হয়েছে বলবেন তো? লেগেছে? পিসিমা অতিকষ্টে কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন—ভূ ভূ ভূ ভূত। বাবা বললেন—কি বলছে! প্রভাত কাকা বললেন— খুব ধীরে ধীরে ভূভূ করছেন। মনে হয় গায়ত্রী মন্ত্রটা নাভির কাছ থেকে অটোমেটিক ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। বলুন, বলুন আর একটু চেষ্টা করুন—ওঁ ভূ-ভূবঃ স্বঃ। বাবা বললেন—না না মেয়েছেলের ওঁ হবে না প্রভাত নমঃ হবে নমোহ। প্রভাত কাকা প্রতিবাদ করলেন গায়ত্রীর ওঁ বাদ গেলে রইল কি ছোড়দা।

বাবা কিছুক্ষণ ভাবলেন, শুনলেন পিসিমা কি বলতে চাইছেন তারপর হঠাৎ একটা হালছাড়া হাসি হেসে বললেন—আরে ধ্যার, তুমিও যেমন ও গায়ত্রীর ভূ বলছে না হে, ভূতের ভূ বলার চেষ্টা করছে। প্রভাত কাকা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভূত দেখেছেন? ও ছোড়দি, ভূত ভূত। পিসিমা অতিকষ্টে মাথা নাড়লেন—কোথায় দেখেছেন?—নিচের ঘরে প্রভাত।—কি ভূত ছোড়দি!—কিন্তু সন্ন্যাসী ভূত হতে যাবে কোন দুঃখে। নিশ্চয়ই ব্রহ্মদত্যি। কিন্তু ব্রহ্মদত্যি বেল গাছ ছেড়ে এখানে কেন? বাবা বললেন— ও সব ভূতটুত নয় প্রভাত, চোর ঢুকে বসে আছে। একটু আগেই তোমাকে বলছিলুম না। সারাদিনই তো খোলা হাওদাখানা। চলো দেখে আসি। বড় শাবলটাও নাও। হ্যারিকেনটা তো নিচেই। তবে চোর হলে এতক্ষণে পালিয়েছে।

শাবল হাতে প্রভাত কাকা নামছেন আগে আগে, পেছনে বাবা, তাঁর পেছনে আমি, আমার পেছনে গদাইদা, গদাইদার পেছনে মালাদি। যত নিচে নামছি ততই একটা ভ্যাপসা ঠান্ডা মনে হচ্ছে ওপর দিকে উঠে আসছে। বাবা বললেন—নিচেটা এরা কি করে রেখেছে দেখেছ। এতগুলো লোক কারুর একটু মনেও হয় না পরিষ্কার করি।

নিচের গলিতে নেমে শাবল-হাতে প্রভাত কাকা পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন উত্তরের শেষ গুম-ঘরটার দিকে। আগেকার দিনে জমিদার হাত পা বেঁধে প্রজাদের ফেলে রাখত। দস্যু সর্দার এইরকম ঘরেই শংকরকে আটকে রেখেছিল। বাবা হ্যারিকেনটা প্রভাত কাকার হাতে তুলে দিলেন। পিসিমা সিঁড়ির শেষ ধাপে

রেখেছিলেন।

আমরা অন্ধকার সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে রুদ্ধনিশ্বাসে ভয়ে প্রাণ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছে। ঘুম পালিয়ে গেছে। জীবনে এই প্রথম ভূত কিম্বা চোর দেখব। ঘরটার দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে পড়েছে। আর একটা খোলা। কোন জানলা নেই। জীবনে ঝাঁট পড়ে না। পাতকোতলা থেকে নর্দমা বয়ে গেছে এই ঘরের গা দিয়ে সোজা সদর রাস্তার। মালকোঁচা মারা প্রভাত কাকা লাফিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বাবা থমকে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। শাবলের খোঁচা খেয়ে চোর বেরলেই বাবার সঙ্গে কোলাকুলি। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। কই তেমন কোন উত্তেজনাপূর্ণ কিছু ঘটছেনা কেন? চোখ খুললুম। প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কেটে গেছে। বাবা বাঘের মত ওত পেতে আছেন। প্রয়োজন হলেই লাফিয়ে পড়বেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একসঙ্গে অনেক গুলো পা, হাই-হিল-জুতো পরে নাচলে যে রকম শব্দ হয় সেই রকম শব্দ হল, তারপরই হুড়মুড় করে কিছু পড়ার শব্দ হল। চোর যদি হয় একটা নয়, পুরো একটা ব্যাটেলিয়ান ঢুকে বসে আছে।

বাবা আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কি হল প্রভাত? যাব? প্রভাত কাকা ভেতর থেকে বিব্রত হয়ে বললেন—আসতে হবেনা ছোড়দা। ব্যাটা কোন নিয়েছে, ঠিক কায়দা করতে পারছি না। বাবা বললেন—শাবলটা দিয়ে লাগাও না এক ঘা। তবে দেখ বেশি জোরে মেরনা। জাস্ট অজ্ঞান করে দাও। মরে গেলে থানা-পুলিস হয়ে জেলে যেতে হবে। খুব সাবধান ওর কাছেও আর্মস থাকতে পারে। আমার দিকে ফিরে বললেন, তোমরাও সব রেডি থাক। যা পাবে তাই দিয়ে মারবে। তারপর গলাটাকে খুব চড়িয়ে বললেন—আয় বেটাচ্ছেলে। প্রভাত কাকা ভেতর থেকে আর অসহায় গলায় বললেন—মারব কি গুঁতোতে আসছে।

বাবা বললেন—খবরদার? সারেন্ডার। হঠাৎ হুড়মুড় করে প্রভাত কাকা আর সেই অদৃশ্য জিনিসটা একসঙ্গে জড়াজড়ি করে একেবারে দরজার বাইরে, আলো-টালো, শাবল-টাবল সবসুদ্ধু নিয়ে। আলোটা উল্টে নিভে গেল। বাবা, বাপস্ বলে পাশে সরে গেলেন। আমরাও বাবারে বলে চিৎকার করে সকলে একসঙ্গে ওপরে উঠতে গিয়ে কেউই আর ওপরে উঠতে পারলুম না, একেবারে সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে এলুম। গদাইদা আমার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে দুম করে আরো বিপজ্জনক এলাকা—গলি পথের ওপর পড়েই বললে—মরে গেছি বটেক। এদিকে ঝড়ের বেগে খটাখট, খটাখট করে কি একটা দৌড়ে আসছে। মালাদি আর আমি তালগোল পাকিয়ে গেছি। কে কোথায় আছি বুঝতে পারছিনা, সেই অবস্থাতেই মালাদি বললে—টাট্টু ঘোড়া বটেক। গদাইদা যেখানে আছে, সেইখান থেকেই বললে—লাথি মেরেছে বটেক। বাবা অন্ধকার কোণ থেকে বললেন—প্রভাত

এটা কি? ঘোড়সওয়ার বলে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে জিনিসটা সদর দরজায় প্রচন্ড শব্দে ধাক্কা মারতেই দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, সেই ফাঁক দিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে বেরিয়ে গেল। বেরবার সময় তার ব্যাঙ্গের গলা শোনা গেল—হুঁহুঁ হুঁহুঁ। প্রভাত কাকা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠতে উঠতে বললেন—রামছাগল ছোড়দা? ভীষণ গুঁতনে স্বভাব। আমার তলপেটে মোক্ষম ঝেড়েছে। বাবা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন—চোরটা কোথায়? —আজ্ঞে ওইটাই চোর, ওইটাই ভূত। — ওটার পেছনে লাগতে গেলে কেন, শুধু-শুধু? —ভেবে ছিলুম শিং ধরে কি দাড়ি ধরে ছোড়দির কাছে টেনে নিয়ে যাব। —কার ছাগল, এল কোত্থেকে। গদাই উঠে দাঁড়িয়েছে, বললে— সুবোধের ছাগল।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বাবা বললেন, তোমাকে আমি বলে রাখছি প্রভাত, ওই ঘরে একদিন দেখবে খুন করে ডেড বডি ফেলে দিয়ে গেছে। তোরা একটু সাবধান হ শশী। ভূত-ভূত না করে, মাঝে মধ্যে একটু আধটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা কর। এই সেদিন সিঁড়ির তলা থেকে সাপ বেরল। আমি বলে ফেলেছি ভূত আর দেখা হলনা? বাবা বললে—ভূত? ভূত আর ভগবান দেখার বরাত চাই, বুঝেছ। তার জন্যে সাধনা চাই। মহাসাধক হওয়া চাই। সে দেখেছিলেন আমার বাবা। শেষের দিকে বাবার গলাটা কিরকম ধরে এল। পুরোন দিন আর ঠাকুরর্দার কথা হলেই বাবার গলার স্বর পাল্টে যায়। ছাত্রজীবনে ঠাকুর্দা গান গাইতে গাইতে ফাঁকা মাঠে বেলগাছের তলা দিয়ে আসছিলেন, গাছ থেকে ব্রহ্মদৈত্য তারিফ করে বলেছিলেন—বাঃ বাবা, বাঃ, বেশ সুন্দর হচ্ছে? তবে বাবা যাই বলুন না কেন, ভূত আছে, এই বাড়িতেই আছে। আজ না হোক, আর একদিন দেখা যাবেই।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মনে হল আবহাওয়াটা পাল্টে গেছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। সিঁড়ির মুখেই জুতোর র‍্যাকের কাছে জ্যাঠাইমা। হাতে একটা এনামেলের গামলাতে খানকতক লাল রুটি, তার ওপর একচাকলা আম। পিসিমার মুখের সামনে পাত্রটা নেড়ে জ্যাঠাইমা কর্কশ গলায় বললেন—এই আমার ব্যবস্থা? তরকারি কোথায়? শেষ সিঁড়ির ধাপটা পেরিয়ে পিসিমা এগিয়ে না গেলে আমরা এগতে পারছিনা। সারি সারি গাড়ি আটকে গেছে। প্রভাত কাকা সব শেষে। হাতের শাবলটা অসবাধানে সিঁড়ির ধাপে লেগে সুন্দর একটা শব্দ হল—ঠ্যাং।

জ্যাঠাইমার মারমুখী ভঙ্গি দেখে পিসিমা থতমত। ভয়ে ভয়ে বললেন—তর—কারিতো সব ফুরিয়ে গেছে মেজবৌদি, তোমার আর আমার দুজনেরই নেই। জ্যাঠাইমা বললেন—তোমার কি আছে, কি নেই, আমি জানতে চাইনা, আমি জানতে চাই, অতটা তরকারি কি হল? বাবুর পেট খারাপ, বাবু খায়নি। তার ভাগেরটাইবা গেল কোথায়? পিসিমা আস্তে আস্তে বললেন—ফুরিয়ে গেল যে। কি করব বল।—ফুরিয়ে গেল যে, কি করব। জ্যাঠাইমা ভেংচি কাটলেন। বাবা বললেন—সর সর আমাদের উঠতে দে। জ্যাঠাইমা এগোলেন, আমাদের মিছিল সচল হল।

জ্যাঠাইমা বললেন— এক চাকলা আম কেন? —আমাদের ভাগে ওই পড়েছে যে। —ভাগে ওই পড়েছে তাই না ঠাকুঝি। তক্তপোশের ভেতর দিকে ইটের পাশে অতগুলো চাকলা কার জন্যে লুকিয়ে রেখেছ শুনি। সকালে মাকালীর পুজো দেবে তাই না? পিসিমার মুখে কোন কথা নেই। কোন কথা নেই দেখে, জ্যাঠাইমা আরো চেপে ধরলেন, এবার তরকারিটা কোথায় সরিয়েছ বল। পিসিমা লাফিয়ে উঠলেন— তোমার দিব্যি মেজবৌদি তরকারি ফুরিয়ে গেছে। —তুলে তুলে ক'বার খেয়েছ। মা মেয়ে মিলে। ওটা একবারেই পেটে সরিয়েছ ঘুরচো ফিরচো আর মুখ চলেছে? বিধবার অত নোলা কেন?

পিসিমা কেঁদে ফেললেন কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বললেন—দেখছ ছোড়দা তোমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি বলে, যা মুখে আসছে তাই বলছে। মাইরি বলছি মেজবৌদি তরকারি আমি খাইনি, আমার ছোট মেয়েটা হাত দিয়ে একটু তুলেছিল তাও সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছি। মিথ্যে বলবনা, আমি গ্রামের মানুষ, খিদেটা বেশি, তাই মাঝে মাঝে দু'চারটে আলো চালের দানা মুখে ফেলি। কথা শেষ করেই পিসিমা হুহু করে কেঁদে উঠলেন আবার। পিসিমার কান্না দেখে মালাদিও হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠল। জ্যাঠাইমা ব্যাঙের গলায় বললেন—কত ন্যাকামোই জান ঠাকুরঝি।

বাবা ভীষণ গলায় বললেন—স্টপ, স্টপ দ্যাট ননসেনস? এটা বস্তি বাড়ি নয়। সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। প্রভাত কাকা জ্যাঠাইমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—বৌদি, ছি-ছি সামান্য খাওয়া নিয়ে তুলকালাম কান্ড করবেন না। অনেক রাত হয়েছে। জ্যাঠাইমা বললেন—থাম, তুমি হলে দু'মুখো সাপ। তুমি আর মুখ নেড়না। বাবা গুম গুম করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন— ওদের সঙ্গে একটা কথা বলবেনা। আমি ব্যবস্থা করছি। আমার জুতোয় পেরেক তুমি কি করবে প্রভাত। আমাকেই ঠুকতে হবে। যতটা বেগে বাবা ঘরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, ততটা বেগে ঢোকা সম্ভব হলনা। মশারির দড়িটা মুখে লাগল। এক টান মেরে দড়িটা ছিঁড়ে ফেললেন। মশারির একটা দিক ঝুলে পড়ল। জ্যাঠাইমা চিপটেন কাটা গলায় বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার ব্যবস্থা আমার জানা আছে। থাকার মধ্যে তিনটে জিনিস আছে, হোমিওপ্যাথির বাক্স, নিজের ক্যাশ বাক্স আর নিজের ছেলে। এখুনি এক ডোজ ব্রাওনিয়া থার্টি ঝেড়ে দিয়ে বলবে, ওই তো মিষ্টি দিয়েছি, বৌদি খেয়ে নাও। নিজের ভোগের শেষ নেই, যত ত্যাগের পরামর্শ আমাদের জন্যে।

বাবা পটাপট মশারির দড়ি ছিঁড়লেন একের পর এক। যেতে চাইছেন উত্তরে। বোধহয় রান্না ঘরে। ওপাশের বারান্দায় পা রেখেই হাঁকলেন—শশী আলো নিয়ে আয়—পিসিমা চোখ মুছতে মুছতে আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। জ্যাঠাইমা বললেন—ওসব রাগ আমি বিয়ে হওয়া তক দেখছি? এ তোমার মেজদা পাওনি যে ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকবে? আমি মুকুজ্যে বাড়ির মেয়ে। এই রইল তোমাদের কুকুর খানা। সবই যখন খেয়েছ এটাও খেতে পারবে। থালাটা ঠকাস করে টেবিলে

নামিয়ে দিয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

মরেছে। উত্তরের ওই দরজা দিয়েই দক্ষিণের একটু বাতাস অন্ধকার ঘরে আসে। পিসিমারা অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকেন। দরজা বন্ধ করে জ্যাঠাইমা সামান্য হাওয়াটাও কেড়ে নিলেন। বাবা এসে গেছেন। হাতে তক্তপোশের তলায় লুকিয়ে রাখা সেই আমের থালা। কোথায় গেলেন তিনি? প্রভাত কাকা বললেন— ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছেন। বাবাকে একটু শান্ত করার জন্যে যোগ করলেন— ছোড়দা ছেড়ে দিন। ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি নাই বা মাথা ঘামালেন? বাবা অন্ধকার ঘরের চৌকাঠ ডিঙতে ডিঙতে বললেন—আমরা নিউটন নই, শেকসপিয়ারও নই, বশিষ্ঠও নই, বরাহও নই। এই সব তুচ্ছ ব্যাপারই আমাদের জীবন।

পিসিমাদের জন্যে এখনও বিছানার ব্যবস্থা হয়নি। লাল ঠান্ডা মেঝেতে কয়েকটা তেলের দাগ ধরা বালিস। সবচেয়ে ছোট বালিসটা বাবার শটে ফুটবল হয়ে গেল। জ্যাঠাইমার বন্ধ ঘর থেকে মিহি সুরে গান ভেসে আসছে—পার কর হে, গৌর হরি। দুম দুম করে বাবা দরজার কিল মারলেন। দরজার পাশ থেকে খড়খড় করে কি একটা সরে গেল। গান বন্ধ হলনা। আবার কিল, এবার জোরে জোরে। ভেতর থেকে মন্থর গলায় জ্যাঠাইমা বললেন—কি হয়েচে? বাবা গলা বিকৃত করে বললেন—এই যে তোমার আম। ব্রাওনিয়া নয়, আম। মালদার ফজলি। রাতটা এই দিয়েই চালাও। কাল সকাল থেকে রাজভোগের ব্যবস্থা হবে। বাপ—ব্যাটা আর সোহাগের বোনকে নিয়ে বসে বসে খাও। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমার গৌর আছেন।

বাবা একটু থমকে গেলেন। এতকাল বিনীত সব মানুষদের চালিয়ে এসেছেন। বিদ্রোহ দমন করতে হয়নি কখনো। বাবার ভেতর থেকে ডায়ার বেরবে কি ওয়াটসন বেরবে। গোলমালে বাবু উঠে পড়েছে। গত তিন দিন ছেলেটা পেটের অসুখে খুব ভুগছে—গবার ডালবড়া, প্রভাত কাকার ফুলুরি, জ্যাঠাইমার আবিষ্কার—ভুসির বড়া আর তেলাকুচো শাকের ঘ্যাঁট সব একসঙ্গে বেরচ্ছে। বাবার হোমিওপ্যাথিই চলছে। বাবু ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মা। কাকাবাবু ডাকছেন কেন মা? দরজাটা খুলে দাওনা?

ছেলের কোন প্রশ্নেরই কোন উত্তর দিলেন না। বরং গানের সুরটাকে আরও তীক্ষ্ণ করলেন—গৌর আমার প্রাণ রে। বাবা প্রায় অন্ধকার ঘর থেকে চিৎকার করে উঠলেন—প্রভাত শাবলটা নিয়ে এস তো। দরজা ভেঙে ফেলবো। কথায়—কথায় দরজা বন্ধ। কথায়— কথায় রাগ। এটা যেন গোঁসা ঘর হয়েছে। কত বড় জমিদারের মেয়ে আমি দেখতে চাই।

ভেতরে গানের সুর আরো উদাও—ওরে নিতাই আমার মাতা হাতি।

বাবা দরজায় গোটা দুই লাথি মেরে বললেন, খুলবে না ভাঙবো? জ্যাঠাইমা উত্তরে বললেন—ওরে নিতাই আমার খেপা হাতি, মাতা হাতি, মাতা হাতি, খেপা

হাতি। এতক্ষণ শুধু গান ছিল এখন শুরু হয়েছে চুটুস চুটুস হাততালি। —প্রভাত ভাঙো দরজা ভেঙে ফেল।

এগিয়ে গিয়ে বাবার হাত ধরলুম। সেই প্রথম আবিষ্কার—মানুষের রাগত চোখও অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। অন্ধকারে একটা আকৃতির অনুভূতি, গরম নিশ্বাস। মুখের একটা অংশ, খাড়া নাকের মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। বাবার হাত কাঁপছে। ভীষণ রাগে ছটফট করছেন। পড়াতে পড়াতে রেগে যান, সে একরকম। তখন মনে হয়না, বাবা ছোট হয়ে গেছেন। মনে হয়না কোণ অন্যায় করেছেন। কিন্তু এই ধরনের একটা নিতান্ত ছোট ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে মাঝরাতে হই হই বাবাকে যেন বাবার আসন থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছে। কই তারকবাবু কি শশাঙ্কবাবু কি হরেণবাবুর বাড়িতে তো এই রকম ঘটনা ঘটেনা।

বাবার হাতটা যেন মোটা শাবলের মতই শক্ত। বড় বড় লোমে খসখসে। হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে। আমার ভয়টা হঠাৎ কেটে গেল। মনে হল আমি যেন মুহূর্তে সমবয়সী হয়ে উঠেছি। আস্তে আস্তে কিন্তু কেটে কেটে বললুম—চলুন বারান্দায় চলুন। অনেক রাত হয়েছে। ছেড়ে দিন ওঁকে। —ছেড়ে দেব? বলিস কি? আমাকে অপমান করেছে। —করুক অপমান। তবু আপনি চলুন। —বলছিস? —হ্যাঁ বলছি। —ঠিক আছে, চল।

দক্ষিণের বারান্দায় সেই আগের চেয়ারে বাবা সোজা হয়ে বসলেন। চাঁদের আলোয় জেলখানার থালার মত থালায় খানকতক রুটি, বঁটির কালো কষ লাগা এক চিলতে আম। পাশেই আর একটা থালায় আরও কয়েক চাকলা আম, বাবা এইমাত্র রাখলেন। —প্রভাত। বাবার গলাটা ভারি শোনাল।—তোমার কি মনে হয় আমি ভুল পথে চলেছি, আমি স্বার্থপর, শয়তান। প্রভাত কাকা বেঞ্চিতে বসেছিলেন চাঁদের আলোধোয়া নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে। মুখ না ফিরিয়েই বললেন—এরা ঠিক ধরতে পারছেনা, বুঝতে পারছেনা অবস্থাটা। তাছাড়া মেয়েরা একটু হিংসুটে হয়। রাইট ইউ আর। হিংসের খেলা চলেছে। কিন্তু প্রভাত। কথাটা শেষ না করে বাবা চাঁদের আলো-মাখা রুটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। —কিন্তু —প্রভাত আজ তো চোখের সামনেই একটা অন্যায় হয়ে গেল। এটাকে নিশ্চয় তুমি গুড অ্যাডমিনিসট্রেশান বলবেনা? এর জন্যে নিশ্চয় আমি দায়ী নই? —না আপনি কেন দায়ী হবেন? —তাহলে দায়ী কে? শশী? শশী চোর?—ঠিক চোর নয় ছোড়দা। সব মাই চায় তার ছেলেমেয়েদের দিকে একটু টানতে, এটা সেই কেস। এর জন্যে অপরাধী মাতৃস্নেহ। —তুমি শশীর অতীত জান? জান না। জানা সম্ভবও নয়। পেটুক বলে ওর একটা বদনামও ছিল। বোনেদের মধ্যে ও ছিল সবচেয়ে ছোট। ভাগ্যটাও খারাপ। তখন ছিল এক পরিস্থিতি, এখন অন্য পরিস্থিতি, এটা ওকে বুঝতে হবে। বোঝাতে হবে।

বাবা গম্ভীর গলায় ডাকলেন—শশী! প্রভাত কাকা বাধা দিলেন—আপনি না,

আপনি না। বোঝাবার ভার আমার।—বেশ তোমার। তুমিই বুঝিও। তবে আমি কি বলছিলুম জান প্রভাত? —বলুন ছোড়দা। তুমি আর আমাদের সঙ্গে কেন কষ্ট করবে। আমাদের দিনতো এইভাবেই চলবে, আরো খারাপ হবে, আরো খারাপ তুমি তো এই ফ্যামিলির কেউ নও, তোমার চলে যাবার উপায় আছে, সরে পড়ার উপায় আছে, এই দুঃখের দিনে তুমি শুধু শুধু কেন কষ্ট করবে।

প্রভাত কাকা ঘুরে বসলেন। হাতের কনুই দুটো টেবিলের ওপর। দু'হাতের তালুর মধ্যে মুখ—ছোড়দা রক্তের সম্পর্ক হয়তো নেই, কিন্তু পূর্বজন্ম থেকে আপনারাই আমার ছোড়দা, মেজদা, আমি ব্যাচেলার বাউন্ডুলে মানুষ। আজ এখানে কাল সেখানে। দুঃখের দিনে আপনার পাশে দাঁড়াই। দেখিনা কিছু করা যায় কিনা যেই সুখের দিন আসবে বলতেও হবে না সরে পড়ব। তখনও দুঃখী পরিবার কোথাও না কোথাও থাকবে, ঠিক খুঁজে নেব।

বাবা যেন অভিভূত হলেন—ঠিকই বলেছ প্রভাত। পূর্বজন্মে তুমি আমাদের ভাই ছিলে। কিসব দিনে তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। মেজদার অসুখ বিল্টুর মার অসুখ, জ্যাঠাইমার অসুখ। কিসব ভোগান্তি। এক বছর, দু'বছর, পাঁচ বছর পড়ে আছে সব বিছানায়। তোমার সেই ঘটনাটা মনে আছে প্রভাত। কোনটা ছোড়দা।—সেই বিল্টুর মার ওষুধ পাওয়া যাচ্ছেনা, বারণ করা সত্ত্বেও তুমি রাত দশটার সময় সাইকেল নিয়ে বেরুলে শ্রীরামপুর থেকে ওষুধ আনার জন্যে। তারপর সেই বালির ব্রিজে।

প্রভাত কাকা—উঃ, বলে একটা শব্দ করলেন। ভারি বুটের শব্দ তুলে রাস্তা দিয়ে বিটের পুলিস যাচ্ছিল, মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল। উঃ, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লোক রেলিংএ ঠেসান দিয়ে পা মুড়ে বসে আছে। অন্ধকারে একটা লোক। ভাল জামাকাপড় পরা। সন্দেহ হল

—তুমি ভেবেছিলে মাতাল কিম্বা সুইসাইড করবে। ঠিক বলেছেন সাইকেল থেকে নেমে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ও মশাই, ও মশাই। সাড়া শব্দ নেই বাবা বললেন—থাক থাক আর বোল না। এরা ভয় পাবে! প্রভাত কাকা তবু বলে চললেন—তারপর যেই না গায়ে হাত দিয়ে একটু ধাক্কা মেরেছি, ও মশাই। ধড় থেকে মুণ্ডুটা খুলে পড়ে গেল।—ওঃ হরিবল্, হরিবল্! খুব বেঁচে গেছ। খুব বাঁচা বেঁচেছো।—শশী। বাবা ডাকলেন—সরা এগুলো। এক গেলাস জল দেত। কোনদিন কাউকে হুকুম করিনা। দে—আজ একটু লাটসাহেবী করি। খেয়েছিস? খাসনি আর কখন খাবি?

জলের গেলাসটা শব্দ না করে বাবা টেবিলে রাখলেন। ঢেউ খেলান কাঁচের গেলাস চাঁদের আলো পড়ে স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে।—যাক অতীত বাদ দাও। এখন বর্তমানে ফিরে এস। এই আয়ের মধ্যে সংসারটাকে কি করে গোছানো যায়। তুমি দ্যাখো, সরে পড়তে চাইলে, আমিও কিন্তু সরে পড়তে পারি। তোমারও যেমন

সংসার নেই, আমারও তো তেমনি সব গেছে। ছেলেটাকে নিয়ে ইঞ্জিলি পালাতে পারি না? সেটা কিন্তু মানুষের কাজ হবে না। ফাইট। ফাইট উই মাস্ট। টিউশানি নিয়েছি। তারপর দ্যাখো চুল আর বাইরে কাটাব না। তোমাকে দিয়ে কাঁচি-চিরুনি আনিয়েছি। জুতো বাইরে মেরামত হবে না। সেলাই, হাফশোল, গোড়ালি সব বাড়িতে। ছেলেদের চুল আমি কাটতে পারব। আমারটা তুমি একটু পারবেনা প্রভাত? তাহলে ধোপা—নাপিত একদম বন্ধ। জুতো সারাই, তাও বন্ধ। মাসে অন্তত টাকা চারেক বাঁচবে।

প্রভাত কাকা প্রচন্ড উৎসাহে বললেন— কেন পারবোনা। চুলছাঁটাই কি এমন শক্ত কাজ। ধাপে ধাপে কেটে কেটে ওপরে উঠব। পাহাড়ের জঙ্গল সাফ করার কায়দা। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, কাল থেকে আমি নিজে হোটেল চালাবার কায়দায় সংসার চালাব। এই আয়ের মধ্যে সকলের সমান খাওয়াপরা। বাবা বললেন—একটা জিনিস, একটা জিনিস প্রভাত। সব সময় মনে রাখবে, যারা মাথার কাজ করে, যারা বেড়ে উঠছে, তাদের ওরই মধ্যে একটু ভাল খাবার দিতে হবে আর মনে রাখবে, মেয়েরা একটু কম খেলেও মরবে না। এই কথা মনে রেখে তুমি কাল থেকে চালাও তো দেখি। ব্যাটাছেলের হাত না পড়লে এ সমস্যার সমাধান হবে না। আর হ্যাঁ, তোমার ব্যবসার কি হল? একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কিছু লাগাও প্রভাত। বাণিজ্য ছাড়া লক্ষ্মী লাভ হয়না। কিছু ভেবে পেলে।

প্রভাত কাকা উদাস গলায় বললেন—সাইকেলের দোকান এদিকে চলবে না ছোড়দা। অন্য কিছু মাথায় আসছে না। একটা মিষ্টির দোকান করলে কিরকম হয়। ধরুন জনাই থেকে কারিগর আনিয়ে মনোহরা তৈরি করলুম, কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর আনিয়ে সরভাজা-সরপুরিয়া, ওদিকে শক্তিগড়ের ল্যাংচা, পানিহাটির গুপো, রামচাকি শ্রীরামপুরের গুটকে। ও হবেনা, হবেনা। বাবা ভীষণ প্রতিবাদ করলেন—ও তোমার লাইন নয়। তোমাকে কম পয়সায় কিছু ভাবতে হবে। তুমি আমার লেখার কালিটা বাজারে চালাও না। এ-ক্লাস কালি। বিলিতি স্টিফেনস্ সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ওরকম ব্লু-ব্ল্যাক তুমি বাজারে পাবে না। প্রভাত কাকা খুঁত খুঁত করে বললেন—কালি চলবে না ছোড়দা। যা বাজার, মানুষকে সস্তায় খাবার দিতে হবে। ওই লাইনে কিছু বলুন।

—না, না তাহলে এক কাজ কর, খাবারের কথাই যখন তুললে তখন আর একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেল—দাঁত। দাঁত হল সবার আগে। দেখছ তো সারা জীবন তুমি আর আমি দাঁত নিয়ে নাকাল। বাঙ্গালীর দাঁতের অবস্থা বড় খারাপ। সস্তায় একটা মাজন বাজারে ছাড়লে কেমন হয়। আমার কাছে সাংঘাতিক একটা ফর্মূলা আছে।

—মন্দ বলেন নি। মাজনটা ভেবে দেখা যেতে পারে। ঠিক আছে আমি একবার কোষ্ঠীটা কাল বিচার করে দেখি। বাবা চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে

সময় প্রচুর খুদিখুদি কাঁকড়া হয়। ইলিশের সময়। ভিজে লুঙ্গি আর কোমরের কাছে বললেন—এর মধ্যে আবার গ্রহ নক্ষত্র ঢোকাবে। তাহলেই সব বিশবাঁও জলে। প্রভাত কাকা বসে বসেই বললেন—না ছোড়দা—ভগাং ফলতি সর্বত্রং। এর আগে আমার ষোলটা ব্যবসা লাটে উঠেছে। এবার পথঘাট সব বেঁধে নামতে হবে।

কাঁচ ভাঙার শব্দে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। মনে হল মুনসীদের নাচ ঘরে ঝাড়লণ্ঠনটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখলুম। আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, ভোরের প্রথম কাকটা কর্কশ গলায় ডাকাডাকি করে অন্য পাখিদের জাগাতে চাইছে। বস্তিবাড়িতে একটা মুরগি উদত্ত স্বরে ডাকতে সুরু করেছে। মাথার দিকের দরজাটা পুরো খোলা। রাতে হাওয়া বেশি থাকলে দরজাটা নানা কায়দায় বন্ধ করে বাবা হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। কখন আধখোলা, কখন সিকিখোলা। এর জন্য একটা কাঠের টুকরো আছে—সারা পরিবারে সেই কাষ্ঠখন্ডটি নৌকার কাঠ নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। বয়স যখন আরো কম ছিল, বাবা আমাকে একটা নৌকো করে দেবার জন্যে ওই কাঠের টুকরোটায় খোদাইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। ইঞ্চিখানেক কাজ এগিয়ে, সংসারের চাপে, পড়ানোর চাপে নৌকো আর জলে ভাসার অবস্থায় এলনা। এখন হাওয়া নিয়ন্ত্রণের একমাত্র হাতিয়ার।

মেঝের বিছানা। পাশেই বাবা। শুয়ে নয়। বসে আছেন ধ্যানস্থ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি যেন সব ভেঙে পড়ল। কাঁচ ভাঙ্গার মত শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখ দেখে মনে হল—সারারাত একটুও ঘুমননি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সব গেল। হায় প্রভু। —কি গেল বাবা—বাবা বললেন—তুই ঘুম। ও নিয়ে মাথা ঘামাসনি। মনে কর সরাইখানায় মাতাল ঢুকেছে! কথা শেষ হতে না হতেই আবাব । শব্দটা আসছে জ্যাঠাইমার বন্ধ ঘর থেকে। বাবা বললেন—আলমারিটা গেল ওঃ—ওর মধ্যে দামী দামী বহু কেমিকেলস আছে রে। আমার কালি তৈরির মালমশলা। সেন্ট তৈরির আতর। সিরাপ তৈরির এসেন্স। সব গেল! সারা রাত ধরে চলেছে। তুই ঘুম।

—একবার যাব বাবা!—কোথায় যাবি! দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! আমার আর একটা ভয় হচ্ছে, কি জানিস? বাবু মার্ডারড! ছেলেটাকে মনে হয় খুন করে ফেলেছে। তার কোন সাড়াশব্দ নেই। ওই একটা মাত্র পথের কাঁটা ছিল। শেষ করে দিতে পারলেই ঝাড়া হাত পা। গোড়া থেকেই তো মেন্‌টালি আনব্যালেনসড্।

—প্রভাত কাকাকে ডাকবো!—প্রভাত কাকা, প্রভাত কাকা কোরনা। এটা আমাদের ব্যাপার! সকাল হোক থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করতে হবে। জীবনে সবচেয়ে যেটাকে ঘৃণা করি, সেই থানা পুলিসই করতে হল।

বাবুর কথা, জ্যাঠামশাইয়ের কথা, সংসারের কথা চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম আবার। কে যেন ভীষণ চিৎকার করছে! ঘুম ভেঙে গেল। কানে এল— আরে তোমরা কিহে এখন পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ! অ্যাঁ। আরে ও শঙ্কর, শঙ্কর। বাবাও মনে হয় সারা রাতের পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন—আরে এস ন'মামা।

মশারির বাইরে মাথার কাছে ন'দাদু এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ন- হাতি ধুতি, হাঁটুর নিচে এসে শেষ হয়েছে। সামনে কোঁচা ঝুলছে। বেশ বড় বড় পা। জীবনে তেল না পড়ে পড়ে রুক্ষ। কাপড়টা তেমন ফরসা নয়। সাদা মোটা একটা জামা গায়ে। বুকের বোতাম খোলা। মুখে একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। বাবার চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। দু'জনের গলার স্বরেও যথেষ্ঠ মিল। ন'দাদু একটু বেশি নস্যি নেন বলে স্বর একটু যা নাকী।

—এখন ঘুমোচ্ছ কেন? এটা কি ঘুমবার সময়। ওঠো ওঠো! বিল্টু তুমিও কি লেট-রাইজার!

প্রায় একই সঙ্গে মশারির ডানদিক তুলে বাবা, বাঁ'দিক তুলে আমি বেড়িয়ে এলুম। বাবা তাকালেন ঠাকুর্দার ছবির দিকে। আমি ভয়ে ভয়ে তাকালুম অন্ধকার ঘরের দিকে। অন্ধকার ঘরটা আরো অন্ধকার। জ্যাঠাইমার ঘরের দরজা বন্ধ। কি হয়ে আছে ওই বন্ধ ঘরে কে জানে? সারা বাড়ি থমথমে। উত্তরের বারান্দায় রেলিংয়ে বসে একটা কাক খাঁ খাঁ করে ডাকছে! ডাকটা এতই অমঙ্গলের যে গা ছমছম করে ওঠে।

ন'দাদুর বগলে একটা মোটা বই! আত্মভোলা বোটানিস্টের মত দেখাচ্ছে। পাশপকেট থেকে লাল খেরো বাঁধানো আর একটা বই বেরুল। সেই বইটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও তোমার অমরকোষ। অমরকোষ না পড়লে বাংলা শেখা যায়? আচ্ছা বলতো কৃতঘ্ন শব্দটা কোথা থেকে এসেছে? কিভাবে হয়েছে।

তখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি। বাবা মশারির দড়ি খুলছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার এক হাতে অমরকোষ; মাথায় জ্যাঠাইমার বন্ধ ঘরের দুশ্চিন্তা, সামনে ন'দাদুর সাংঘাতিক প্রশ্ন। উত্তর একটা দিতেই হবে। বললুম নিমকহারাম। ন'দাদুর গোঁফদাড়িঅলা মুখে শিশুর মত হাসি—হে-হে-হে, ওটা তো হল মানে, আমি জিজ্ঞেস করেছি উৎপত্তি। শঙ্কর কৃতঘ্নর উৎপত্তি বলতে পার?

মশারি পাট করে বিছানা রোল করতে করতে বাবা বললেন—যন্দুর মনে হয় কৃতপূর্বক হন ধাতুর অ। ন'দাদু খুব খুশি—ঠিক বলেছ। তুমি জান, তোমার ছেলে কিন্তু জানেনা। তুমি বললে নিমকহারাম। নিমকহারাম শব্দটা কোথা থেকে এসেছে বিল্টু ফারসি, নিমক মান নুন, আরবি হারাম মানে শূকর দুয়ে মিলে নিমকহারাম। তুমি সাতটা অবধি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছ আর নিমকহারাম বলতে পারছোনা! শঙ্কর ভোরবেলা একে ঠেলে তুলে দেবে, এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে মুখস্থ করবে। শব্দরূপ,

ধাতু রূপ, কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বগলে ওই মোটা বইটা কি ন'মামা!—তুমি ভুলে গেলে শঙ্কর, এটা বোটানি। কথা ছিলনা, তোমার বাগানের ফার্ণ চিনবে। চল, চল বাগানে চল। দেখি তোমার অন্য গাছপালা কেমন হল। মুখ পরে ধোবে। বাগানে নামার এই তো সময়!

বাবা খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বাগানে নেমে ভাঙা পাঁচিলের গায়ে, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গজিয়ে ওঠা ঝিরিঝিরি পাতা ফার্ণ চেনার মত মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। ওদিকের বন্ধ ঘরে ভয়াবহ কিছু ঘটে আছে। দেখা দরকার। সত্যিই থানা পুলিস করতে হবে কিনা কে জানে! ন'দাদুকে বলতেও পারছেন না। আত্মভোলা জ্ঞানপাগল মানুষ। সংসার টংসারের ধার ধারেন না। বাবা বললেন, তুমি একটু বাইরের চেয়ারে বস। চা-টা খেয়ে নামা যাবে! এসব রবিবারে হলে ভাল হয়না?

ন'দাদু হই হই করে উঠলেন—তোমার ওই দোষ শঙ্কর। চা! একদিন চা না খেলে কি হয়? অফিস! সারাজীবনই তো অফিস আছে। একদিন অফিস না গেলে কি হয়! তোমার জন্যে অফিস অচল হয়ে যাবে না!

বাবার হাতে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট। ন'দাদুর চাপে পড়ে একটু অসন্তুস্ট হয়েছেন মনে হচ্ছে। —আচ্ছা, পাঁচ মিনিট সময় দাও। মুখটা অন্তত ধুয়েনি। উত্তরের অপেক্ষা না করে উওরের বারান্দায় যেখানে জল থাকে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। ন'দাদু আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন যেন তোমাকে আর তোমার বাবাকে দিয়ে কিস্যু হবে না। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, ওয়াকিং ফার্ণ কাকে বলে জান? যে ফার্ণ চলে বেড়ায়। তোমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, ঝুলনতলা দিয়ে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে, সোজা কাঁয়েদের বাগানের মধ্যে দিয়ে একেবারে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। এর জন্ম স্থান কোথায় জান! আমেরিকা। তবে তোমাদের বাগানেও থাকতে পারে!

হঠাৎ জ্যাঠাইমার ঘরের দরজা খুলে গেল। অন্ধকার ঘরের লাল মেঝেতে আলো লুটিয়ে পড়ল। প্রথমে মনে হল এক দৌড়ে রান্নাঘরে পালাই। এখুনি রক্তমাখা খুনী বেরিয়ে আসবে। জ্যাঠাইমা বেরিয়ে এলেন। কোঁকড়া চুল এলো। মুখের সামনে ঝুলে আছে কয়েকটা গুচ্ছ। গায়ে জামা নেই। শাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে পেছনে। হাতে ছোট মত একটা পেতলের ঘট। চোখমুখের দৃষ্টি উদাস। মুখে গানের কলি—রাই জাগো, রাই জাগো বলে ডাকে শুকশারী। যত কাছে এগিয়ে আসছেন ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ন'দাদুকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিলেন না।

ন'দাদু একবার মাএ তাকিয়ে বললেন—স্ট্যাগ হর্ন ফার্ণ কাকে বলে জান? এরা হল গলা টেপা ফার্ণ। ধরো তোমার পায়ের কাছে হয়েছে। তুমি সরছোনা। তোমাকে জড়াতে জড়াতে ওপর দিকে উঠছে। ব্যাস যেই তোমার গলার কাছে এসেছে—একেবারে টুঁটি টিপে শেষ করে দেবে। ন'দাদু যখন টুঁটিবলছেন, সামনের

ঝকঝকে দুটো দাঁত গোঁফদাড়ির ভেতর থেকে এমনভাবে বেরিয়ে এসেছে যেন জ্যান্ত মুরগির গলায় দাঁত বসাচ্ছেন, আর ঠিক তখনই জ্যাঠাইমা আমার কাছাকাছি এসে, জলভর্তি একটা ঘট আমার পায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—এইটা হল বিছের জালি। শয়তানের শয়তান। দেখ না তোর কি করে দিলুম। খোঁড়া হয়ে যাবি। খোঁড়া ল্যাং-ল্যাং-ল্যাং। ঘটটা জোরে ছুঁড়েছেন। পায়ের সামনের হাড়ে এসে লেগেছে। বেশ লেগেছে। ফুল, বেলপাতা, গঙ্গার জল পায়ের পাতার ওপর থকথক করছে।

ন'দাদু বললেন—কি হল? পড়ে গেল বুঝি! স্ট্যাগ হর্ন তুমি পাবে আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায়। গরমের গাছ। পাতার তলায় সরু-সরু রোঁয়া। রসকষ সব শুষে নেবে। স্ট্যাগ হর্নের কীর্তি শুনলে তোমার গায়ে কাঁটা দেবে!

ঘটটা ঠন করে মেঝেতে পড়ে গড়াতে গড়াতে নর্দমার দিকে চলে গেছে। জ্যাঠাইমা খপ করে ন'দাদুর হাত ধরেছেন—ন'ঠাকুর দেখবেন আসুন, আপনার মেজ ভাগনের কি অবস্থা করেছি। ন'দাদু অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—ঘুম থেকে উঠেছে! জ্যাঠাইমা হাত ছাড়েন নি টানতে টানতে নিজের ঘরের দিকে নিয়ে চলেছেন—হ্যাঁ চিরনিদ্রা ঘুচিয়ে দিয়েছি। মটকা মেরে আর কতকাল পড়ে থাকবে। দেখবেন আসুন না, কি করে দিয়েছি। ঘুচিয়ে- দিয়েছি মটকা।

ন'দাদুর জগৎ আলাদা, জ্যাঠাইমার জগৎ আলাদা। ন'দাদুর জগতে, গাছপালা, প্রত্যয়, প্রকরণ, জ্যামিতি, অঙ্ক, হাতের কাজ। জ্যাঠাইমার জগৎটা কি, বাবা বলেন, দেবাঃ নজানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ। ন'দাদু জ্যাঠাইমার টানে নেচে নেচে চলেছেন, বগলে বোটানি। আর সেই মুহূর্তে বাবা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রথমে বুঝতেই পারিনি। গায়ে এক ফোঁটা জল পড়তে টের পেয়েছি। আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ-কি?

আমি কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে কাঁদতে বললুম, আমাকে খোঁড়া করে দিয়েছেন! বাবা অবাক হয়ে বললেন—কে খোঁড়া করে দিয়েছে? —জ্যাঠাইমা। ওই দেখুন ঠাকুরের ঘটপায়ে ছুঁড়ে মেরে বললেন. আমি খোঁড়া হয়ে যাব। বাবা ঘটটার দিকে তাকিয়ে বললেন—স্কাউন্ড্রেল। কই হাঁটো তো।

সারা ঘরটা গোল হয়ে হেঁটে এলুম। ডানপায়ের ওপর যে জায়গাটায় ঘটটা সজোরে লেগেছিল, সেই জায়গায় অল্প একটু ব্যথা ছাড়া খোঁড়া হয়ে যাবার আর কোন লক্ষণ দেখলুম না। বাবা উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার হাঁটা দেখছেন—যেন জুতোর দোকানে নতুন জুতো পায়ে হাঁটছি। —কি বুঝলে? খোঁড়া হয়েছ?—আজ্ঞে না। হবে না। অসভ্যতার কোন ক্ষমা নেই। আমি এর চূড়ান্ত দেখতে চাই। আমি আজই এর শেষ দেখতে চাই।

বাবা গামছাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভীষণ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। সারারাত ঘুমোননি। চোখ লাল। একদিন অন্তর দাড়ি কামান। আজ দাড়ি কামাবার দিন।

খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর বিন্দু বিন্দু জল। হন হন করে জ্যাঠাইমার ঘরের দিকে এগোলেন। কিছু দূর গিয়ে বড় চৌকাঠটা ডিঙোতে গিয়ে কি ভেবে থেমে পড়লেন একটু ইতস্তত ভাব। বোধহয় ন'দাদুর উপস্থিতিতে কিছু করতে চান না। ফিরে এলেন। ফিরে এসে যে ঘটটা মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল সেটাকে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। একটু টোল খেয়েছে। উবু হয়ে বসে ফুল বেল পাতা সব ভরে ফেললেন ভেতরে। বসে বসেই বললেন, যাও হাত-পা মুখ সব ধুয়ে এসো। তোমার কাজ তুমি কর। হ্যাঁ, যাওয়ার আগে, তুমি সাবধানে একটা কাজ করে যাও—দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে শুধু দেখে এস ঘরের ভেতরে অবস্থাটা কি! ভয় পাবে- না। বি বোল্ড!

দরজার পাশ থেকে ঘরের ভেতরে তাকাবার সময় মনে হচ্ছিল আমি কোন বকের গুহা দেখতে চলেছি। ঘরের মেঝেতে ফিনকি ফিনকি কাঁচের টুকরো। জ্যাঠামশাইয়ের ছবিটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সারা ছবিতে নখের আঁচড়। ছবিটা যে দেয়ালে ঝোলান ছিল, সেই পেরেকে ঝুলছে শ্রী গৌরাঙ্গের ছবি। ন'দাদু সামনে ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বলছেন—কে তুলেছিল বৌমা, ক্যামেরা চালাতেই জানে না। আউট অফ ফোকাস। ভাল করে ওয়াশ করতেও পারেনি। জ্যাঠাইমা বলছেন— শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রাণরে। ন'দাদু বলছেন—তুমি আবার ওদের দলে ঢুকলে কবে। অ্যাঁ। সব ব্যাটা ভন্ড।

জ্যাঠাইমা আরো সুরেলা গলায় গাইলেন- গৌরউউর আমার প্রাণরে। ন'দাদু বললেন- বেশ করেছ, আউট অফ ফোকাস ছবি ভেঙে ছিঁড়ে ফেলেছো বেশ করেছো, তবে তোমার গৌরাঙ্গের মুখটা বাপু ঠিক আঁকতে পারেনি। মনে হচ্ছে, আমাদের সুবল গালে পান-জর্দা ঠুসে বসে আছে। আর্টিস্টের কোন প্রোপোরশান জ্ঞান নেই। আজানুলম্বিত বাহু ছিল ঠিকই কিন্তু ও হাত মাথার ওপর থেকে নিচে নামলে ওরাং ওটাংয়ের মত মাটি ছোঁবে। ছবি আঁকা অত সোজা নাকি! আমি মা দুর্গা এঁকেছি দেখে এসো একদিন। অষ্টভুজা!

জানালার গরাদ ধরে বাবু চুপটি করে দাঁড়িয়ে। কপালের ডানদিকটা ফুলে লাল হয়ে আছে। ক'দিন অসুখে ভুগছে। মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। গায়ে ঢলঢলে একটা গেঞ্জি। ইজেরটা নেমে এসেছে পেটের নিচে। জ্যাঠাইমা গান থামিয়ে হঠাৎ বললেন—ন'ঠাকুর এদের দু'ভাইকে ঠিক আপনার মত দেখতে। নাকটা উঁচু বটে সামনের দিকটা টিয়াপাখির মত বাঁকা। হিহি টিয়াপাখির মত বাঁকা। কেউ বিশ্বাস করবে এই বাপের ওই ছেলে। শনিবার ঘোর অমাবস্যায় জন্মেছে। প্রভাত ঠাকুরপো বলেছে চোর হবে। ন'দাদু বললেন, তুমি বুঝি জাননা বৌমা—নরানাং মাতুলক্রমঃ

বাবা হঠাৎ সিস সিস করে উঠলেন। চমকে ফিরে তাকালুম। অধৈর্যের হাত নেড়ে বললেন-- চলে এস। কি দেখলে? প্রথমেই যেটা বলা দরকার মনে হল—বাবু বেঁচে আছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারের জানলায়। কপালের ডান পাশটা ফুলে

আছে লাল হয়ে।—আর ভাঙ্গাভাঙ্গির কি দেখলে!—জ্যাঠামশাইয়ের ছবিটা ভেঙে পড়ে আছে মেঝেতে। আলমারিটার কি অবস্থা দেখলে!—ওটা দেখতে পেলুম না, এদিকের দেয়ালেতে! —বিপদে পড়েছে ন'মামা! বাবুকে মনে হয়ে বেরুতে দিচ্ছেনা? বেঁধে রেখেছে কিনা দেখলে? এই সময় ওর একটা ওষুধ পড়ার কথা ছিল। আর এক পুরিয়া পড়লেই পেটটা ধরে যেত! কিন্তু কে এখন ওকে রেসকিউ করবে।

—টিইইই, প্রভাত কাকা ঘরে ঢুকলেন। আদুর গা। পৈতে ঝুলছে। প্রভাত কাকার বুকে চুল নেই। মসৃণ গা। মালকোঁচা মারা কাপড়। একটা ফুল হাতা শার্ট, হাতা দুটো সামনে কোমরের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পেছনে বাঁধা। জামার পিঠের দিকটা সামনে অ্যাপ্রণের মত ঝুলছে। হাতে একটা কাঁসার থালায় দু-কাপ চা।—বিল্টু ব্রেকফাস্ট রেডি! বাবু ব্রেকফাস্ট রেডি! চা টেবিলে ছোড়দা?

—তাই দাও। তুমি ওঘরেব অবস্থা কিছু জান প্রভাত?

টেবিলে চায়ের কাপ রাখতে রাখতে প্রভাত কাকা বললেন—জানি ছোড়দা, টিয়াপাখির মত বাঁকা।—কি করে জানলে? দরজা তো বন্ধ ছিল?

—কেন, আমি ওই কার্নিসের দরজাটা খুলে, কার্নিসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জানলার বাইরে থেকে দেখে এসেছি।—সেকি ভাঙ্গা কার্নিস! পড়ে মরোনি, কি ভাগ্য! —আমি তো এখন মরবোনা ছোড়দা! আপনার মনে আছে সুইসাইড করবো বলে এক তাল আফিং খেয়ে ট্রেনে উঠেছিলুম। হরিদ্বারে সুইপাররা ধরাধরি করে ব্যাঙ্ক থেকে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে দিল। এক সন্ন্যাসী এসে জল ছিটিয়ে বাঁচিয়ে দিলেন। তিনমাস পরে সাধুর ডেরা থেকে ফিরে এলুম, হিপনটিজ্‌ম শিখে। নিন চা খান। চায়ে গরম।

প্রভাত কাকা চা হেঁকে চলে যাচ্ছিলেন। বাবা জিগ্গেস করলেন-আমার আলমারিটা প্রভাত ঠিক আছে?

—একটা কাঁচ গেছে ছোড়দা।—যাবার আগে তুমি দুটো অসহায় প্রাণীকে উদ্ধার করার সাহস রাখ!

থালাটাকে বুকের কাছে ঢালের মত ধরে প্রভাত কাকা বাবার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারেননি, বাবার কথা।

—ও ঘরে ন'মামা আর বাবু আটকা পড়েছে। কোন রকমে রেসকিউ করে আনতে পার? —খুব পারি। —তবে দেখ ন'মামা বাইরের লোক তার সামনে সংসারের কেচ্ছা যত কম প্রকাশ হয়ে পড়ে ততই ভাল। একটু কায়দা করে করতে হবে।

প্রভাত কাকা থালাটা একপাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। শরীরের সামনে জামার ঝালরটা খুলে ফেললেন। ভাঙা আলমারি থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া গীতাটা [illegible]ন করলেন। ঘরের মেঝেতে একটা থ্যাঁতলানো করবী ফুল পড়েছিল, বাবা [illegible]গুলো ঠিক তুলতে পারেননি। সেই ফুলটা ডানকানে গুঁজলেন। ঠিক গোঁসাই [illegible]কুরের মত দেখাচ্ছে। চোখ দুটো নিমেষে ঢুলু-ঢুলু হয়ে গেল।

—যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অন্ধকার-ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেন অভ্যুত্থানমধর্মস্য এবার খোলা দরজার সামনে। তদাত্মানং সৃজাম্যহম। ঘরে ঢুকে পড়েছেন। হে ভারত! যখন, যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সময়ে আপনাকে সৃষ্টি করি। এঘরে বিধর্মী যাঁরা আছেন সরে পড়ুন। গীতাপাঠ হবে। ন'মামা আপনি তো শাক্ত, চলে যান, ওই বাইরের টেবিলে আর এক শাক্ত বসে আছেন ওখানে। চলে যাও বাবু সোজা রান্না ঘরে — স্যাংচুমারি খ্যাংখোল—সোজা রান্না ঘরে। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেতা যুযুৎসবঃ, ওরে সমবেত যুযুৎসবঃ, মামকাঃ পান্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বতঃ সঞ্জয়। ঠেঙিয়ে শেষ করে দাও অর্জুন। তুলো ধোনা করে দাও কৌরবপক্ষকে। না, কৃষ্ণ সখা আমার! তা তো পারব না, এঁরা আমার জ্যাঠা-খুড়োর দল। কি বললি র‍্যাসকেল, আমার কথার অমান্য। রইল তোর রথ, রইল তোর ঘোড়া। জানিস আমি কে! আমি কৃষ্ণ। ভক্তরা আমায় কেষ্ট বলে। এ তোর রবীন্দ্রনাথের চোর কেষ্ট নয়। রইল তোর গীতা।

ন'দাদু আর বাবু আগেই বেরিয়ে এসেছে। প্রভাতকাকা বাইরে এসেই পাশ থেকে দরজার খিল তুলে দিয়ে, যাত্রা দলের অভিনেতার মত হাহা, হাহা করে হেসে বললেন একটু পরেই কুরুক্ষেত্রে! আমি গরম ফুলুরি আর চা পাঠাচ্ছি। কোনরকম গোলমাল করলেই বিশ্ব দর্শন করাবো। আমি এই ঘোর কলির অবতার প্রভাত, মরণ মারণ উচাটন ঝাড় ফুক সব জানি। দাঙ্গার সময় সাতটার পেট উসকে দিয়েছি, আমি সাতমারি সহস্রমারি পালোয়ান। পারি না এমন কাজ নেই। যদাযদাহি ধর্মস্য, হাহা হাঃ হাঃ হিইই।

প্রভাত কাকা এঘরে এসে জামাটা আবার আগের মত করে পরে ফেললেন থালাটা তুলে নিলেন। বাবার মুখ দেখে মনে হল অনেক প্রশ্ন জমে আছে। ন'দাদুর চাপে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছেন না। ন'দাদু আবার বোটানির রাজ্যে ফিরে এসেছেন—বুঝলে শঙ্কর, ন'হাজার রকমের ফার্ণ আছে। জান তো এদের বীজ হয় না। পৃথিবীর প্রাচীনতম গাছ। কোল এজে এদের খুব বাড়বাড়ন্ত ছিল। ন'দাদু খুব শব্দ করে চা খান। প্রতিটি চুমুকে ফড়াস ফড়াস করে আওয়াজ করছেন। বুঝতেই পারছি বাবা ভীষণ অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। ন'দাদু বলছেন, সবচেয়ে সুন্দর ফার্ণ কি জান শঙ্কর—হোলিফার্ণ। যেমন করেই হোক আমাকে একটা সংগ্রহ করতে হবে। কত টাকা দাম নেবে। বিলেত থেকে আনাবো, সুইজারল্যান্ডে পাওয়া যেতে পারে কি বল?

বাবা অতিকষ্টে, ন'দাদুর অনবরত কথার ফাঁকে কোনরকমে একটু ফাঁক খুঁজে নিয়ে বললেন—আজকে ফার্ণ থাক। বড় বিব্রত হয়ে রয়েছি। দেখলে তো বৌদির অবস্থা রবিবার ছুটির দিন হবে। বেশ ধীরে সুস্থে। বাবার কথা শেষ হতে না হতেই, ঘরের রাস্তার দিকের জানলায় দাঁড়িয়ে জ্যাঠাইমা ডাকছেন—সন্তোষ ঠাকুরপো ও সন্তোষ ঠাকুরপো।

বাবার মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠছে। নিজের মনেই বললেন—সেরেছে

সন্তোষদার দোকানে তখন প্রচুর খদ্দের। সকালের রাস্তা, লোক গিজ গিজ করছে। সন্তোষদার দোকানের সামনের বেনচিতে মুনসীদের দারোয়ান বিশাল নাগেশ্বর বসে আছে। হাতে পেতল বাঁধানো ইয়া মোটা লাঠি। সেই লোকটি স্নান করতে চলেছেন, যার একটা পা কাঠের। যুদ্ধে গিয়েছিলেন। শুনেছি ক্যাপটেন ছিলেন। সেই সময় ডান পাটা গিয়েছে। সন্তোষদা চিৎকার করে বললেন—জয় গুরু। লোকটি মন্ত্র পড়তে পড়তে আসছিলেন। মন্ত্র থামিয়ে উত্তর দিলেন--জয় গুরু।

জ্যাঠাইমা গলাটাকে আর একটু চড়িয়ে দিলেন, এবার ঠাকুরপো বাদ, সন্তোষ ও সন্তোষ! বাবার পরামর্শ ন'দাদুর মনঃপুত হয়নি। আপন মনে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। বাবার স্বগতোক্তি-মান সম্মান আর কিছু রইল না। রাস্তার গোলমাল পেরিয়ে শেষ ডাকটা সন্তোষদার কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দোকান থেকে মুখ বের করে ওপর দিকে তাকাতে চাইলেন। আর সেইটাই হল কাল। পাশে-পেছনে চতুর্দিকে ধাপে ধাপে কাঠের তাক। তিন সারি, চার সারি। থাকে থাকে সাজানো, মোয়া, আইসক্রিম, লেমোনেডের বোতল, সিগারেটের টিন, প্যাকেট, দেশলাই। লাফিয়ে উঠতেই মাথাটা গিয়ে লেগেছে পেছনের তাকে। ছোটখাটো একটা ভূমিকম্পের মত হয়ে গেল। ঠংয়াঠং-ঠংয়াঠং করে সিগারেটের টিন পড়ছে। দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে সন্তোষদা কোনরকমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। পালাবার তো পথ নেই।

এর মধ্যে নাগেশ্বর এককান্ড করে বসল। বেনচির পায়ার ফাঁকে পা গলিয়ে, সামনে কোলের ওপর ভুঁড়িটা রেখে আরাম করে খইনি ডলছিল। সোডার বোতল ফাটার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে গেল। পালাবে কি করে। গোদা পা তো, বেনচির পায়ার ফাঁকে আটকে গেল। নাগেশ্বর উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বেনচি উঠল। তারপর পেতল মোড়া লাঠি, বেনচি, খইনি সবশুদ্ধ নিয়ে কেতরে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ল। পাশেই রাজেনবাবুর চায়ের দোকানের সামনে পাড়ার বিখ্যাত শম্ভু ষাড়। গত পরশুই যে থানার দারোগাবাবুকে গুঁতিয়ে হাসপাতলে পাঠিয়েছে। একটা লেড়ো বিসকুটের দাবীতে ঘোঁড়োৎ ঘোঁড়োৎ শব্দ করছিল। শম্ভুর হঠাৎ মনে হল, দেখি আর একটা শম্ভু বেনচি বুকে নিয়ে রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে কি কারণে। ষাঁড় জাতির ওপর কোন আত্যাচার শম্ভু একেবারেই সহ্য করতে পারে না। শম্ভু দুলকি চালে নাগেশ্বরকে দেখতে আসছে। 'বেনচি কলে' ধেড়েইঁদুরের মত নাগেশ্বর আটকে গেছে। শুয়ে শুয়ে চিৎকার করছে—জয় শিব শম্ভু। জয় শিব শম্ভু। এ সোন্তোষবাবু কুছ তো কিজিয়ে। জয় শিবশম্ভু। সন্তোষদা দোকানে সীটে বসে বসেই করছেন--পেরভু, পেরভু, পেরভু।

জ্যাঠাইমা সমানে চিৎকার করছেন-- সন্তোষ ও সন্তোষ। বাবা, ন'দাদুকে বলছেন--আজ ফার্ণ থাক। দেখছো তো অবস্থা। একটা কিছু করতে না পারলে পাড়ায় ঢিঢি পড়ে যাবে।

ন'দাদু বোধহয় অবস্থাটা বুঝলেন, বললেন--শঙ্কর তোমার মনে আছে আমাদের আর্টিস্ট ভূপেনকে একবার পরীতে পেয়েছিল। বৌমাকে মনে হয় ভূতে পেয়েছে।

আমি বরং নিবারণ ওঝাকে একবার পাঠিয়ে দি। সরষে পোড়া মারলেই ঠিক হয়ে যাবে। বাবা বললেন—উঁহু উঁহু ওঝা টোঝার দরকার হবে না। পারলে প্রভাতই পারবে। ওর অনেক ঝাড়-ফুঁক জানা আছে। ন'দাদু বললেন—জানতো শঙ্কর, মুড়ি আর ভুঁড়ি দুটোর মধ্যে ভীষণ যোগ। তুমি ডাবের জল আর জটামাংসীর জল একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াও। তবে চারু কী বলছিল জান—এবাড়িতে একটা শান্তি স্বস্ত্যায়ন দরকার। পর পর এত গুলো মৃত্যু হয়ে গেল। বাড়িটা তোমাদের ঠিক সহ্য হল না। বহুদিন ধরেই আমরা শুনে আসছি—এটা ভূতের বাড়ি।

রাজেনবাবু দুটো লাঠি-বিস্কুট হাতে শম্ভুকে ডাকছেন—মহারাজ এদিকে এস, এদিকে এস। সন্তোষদা সিগারেটের টিন, সোডার বোতল ঠেলে ওঠার চেষ্টা করছেন। বিড়ি বাঁধা বন্ধ রেখে, মামা নেমে এসেছেন। নাগেশ্বরকে ধরে তোলার ক্ষমতা তাঁর নেই। নাগেশ্বরের পাশে মামা শিশু। মামা বলছেন—দমকল ডাকতে হবে। বেনচির পায়ের সঙ্গে নাগেশ্বরের পা জড়িয়ে গেছে। রাজেনবাবু ডাকছেন আয় শম্ভু আয়। জ্যাঠাইমা সমানে ডেকে চলেছেন—সন্তোষ ও সন্তোষ। সন্তোষদা বিশ্রী একটা গালাগাল দিলেন। একটা বোতল গড়িয়ে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আর শম্ভু ঠিক তখনই বেগধারণ করতে না পেরে, ছর ছর করে জল ছাড়তে শুরু করল। নাগেশ্বরও একটা গালাগাল দিয়েই বুঝলো—শিবের বাহনকে গালাগাল দেওয়া ঠিক হল না, তারস্বরে বলতে লাগলো—জয় শিবশম্ভু।

গালাগাল দুটোই বাবার কানে গেছে। আমাকে বসে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের এত হই হই বাইরে। কাকে গালাগালি দিল? তুমিই বা ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

—নাগেশ্বর বেনচি নিয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়েছে। সন্তোষদার দোকানের সমস্ত তাক ভেঙে পড়ে গেছে। সোডার বোতলকে গালাগাল দিচ্ছেন। বাবা রাগরাগ গলায় বললেন—সকালটা তুমি এইভাবেই মজা দেখে উড়িয়ে দেবে ভেবেছ। সরে এস ওখান থেকে। যাও খেয়ে দেয়ে পড়তে বস। প্রভাতকে একবার পাঠিয়ে দিও।

ন'দাদু বই বগলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছেন—সরষে-পড়াকে তুমি যাতা ভেবোনা না শঙ্কর। সাদা সরষে চাই। শ্বেতসর্ষপ। ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যেভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। হাবুর মাকে মনে আছে শঙ্কর। প্রায়ই ভূতে ধরতো। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচখচ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ। বাইরে রাস্তায় সন্তোষদার গলা—শালার ব্যাটা শালা। বাঁশ পেটানোর শব্দ। শম্ভু দৌড়াচ্ছে। বাবা বললেন—পাড়াটা ক্রমশই ছোট লোকের পাড়া হয়ে উঠছে। এইবার একদিন প্যাঁদানি খাবে আমার কাছে। প্যাঁদানি বললেই বুঝতে হবে বাবা খুব রেগে গেছেন।

বাঃ, বাঃ, রান্না ঘরের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। একটা সকালেই এত পরিবর্তন। লম্বা টেবিলটা ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল হয়ে গেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দুটো

রেকাবিতে, দু'খানা করে ফুলো ফুলো পোড়া পোড়া খড়খড়ে রুটি। পাশেই এক কাপ করে চা। উনুনের কাছে প্রভাত কাকা হাত দিয়ে ডাল নাড়ছেন। চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে। বহুদিন পরে এত সুন্দর ডালের গন্ধ নাকে লাগল। প্রভাত কাকা বললেন, আজকে মেনুটা দেখে নাও। দেয়ালে সাঁটা আছে।

ব্রেকফাস্ট—কড়া সেঁকা দুটো ডাঙকেক, এক কাপ চা। ব্র্যাকেটে চিনি চাইলে দুঃখিত। লাঞ্চ—ভাত, মাখম সিম দিয়ে মুগের ডাল, ঝিঙে পোস্ত, একটা কাঁচা লঙ্কা, একটু নুন, চাইলে এক গাঁট কাঁচা তেঁতুল। ব্র্যাকেটে, খুঁতখুঁত করলে গলা ধাক্কা। ইভনিং টি-ভেলি গুড় উইথ ছোট একবাটি মুড়ি, নো সরষের তেল, নো পেঁয়াজ। পছন্দ না হলে গেট আউট, ব্র্যাকেটে। ডিনার—গোদা রুটি, অরহর ডাল, উইদাউট ঘি। তলায় প্রভাত কাকার সই, তারিখ। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এর ওপর কারুর কিছু প্রয়োজন হলে--ফেল কড়ি মাখ তেল।

পিসিমা শিলে পোস্ত বাটছেন দুলে দুলে। প্রভাত কাকা বললেন- তোমার ভাগটা তুমি মেরে দিয়ে সড়ে পড়। আর একটা বাবুর। সে কোথায়?— বাবা আপনাকে একবার ডাকছেন। আমার এখন যাবার সময় নেই। বাবুদের অফিসের ভাত দিতে হবে। কঁড় কৌচি। জানি না।— ছোড়দাকে এখানে আসতে বল-আমার রান্না স্পয়েলড হয়ে যাবে। প্রভাত কাকা ভীষণ চিৎকার করে বললেন—ছোড়দি কিমাটা তৈরি হয়েছে। মালা পোয়াটাক কিসমিস ভিজিয়ে দে। গদাই মাছটা বের করে পাতকোতলায় ফেল।

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন—এসব কোথায় প্রভাত।

—স্বপ্নে, স্বপ্নে, সব স্বপ্নে।—তবে বলছ যে।—বলব না। আশেপাশের বাড়িকে শোনাতে হবে তো। ভেতরের অবস্থা জানতে দেব কেন। ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন। ওরে দইটা জমেছে কিনা দ্যাখ।

ছাদের সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে বাবু চুপ করে বসে আছে। কপালটা কাছ থেকে দেখলুম। থেতলে গেছে। শরতের অতি-নীল আকাশ থেকে মেঘ চুঁইয়ে রোদ ঝরছে ফিনকি দিয়ে।—তোর কপালটা এইভাবে কাটল কি করে রে।

—মা দেয়ালে ঠুকে দিয়েছে দাদাভাই।

--সে কি রে।—মার কি হয়েছে বল তো?

—খুব রেগে গেছেন মনে হয়।

বাবু কড়মড়ে রুটিতে একটা কামড় দিয়ে বললে—বেশ সুন্দর খেতে হয়েছে। এরকম রোজ হলে ভাল হয়।—রোজই তো হবে। প্রভাতকাকা ভার নিয়েছেন। দেখিসনি রান্না ঘরের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। আজ দুপুরের ডালটা যখন খাব দেখবি কি সুন্দর। মাখম সিম দেওয়া।— আমাদের গাছের সিম?—তাই হবে মনে হয়।

বাবুর হাতে আধখানা রুটি। মুখে কুড়ুর মুড়ুর আওয়াজ। বাবু হঠাৎ বললে--আমার বাবা নেই তো, তাই মার এত রাগ? তোমার কেমন বাবা আছে।-- আমার যে তেমনি মা নেই। বদলাবদলি, কি বল।— মা না থাকলে কি হয়। আসল তো বাবা, বল

দাদা ভাই।

রান্না ঘরের কাছে বাবার গলা—প্রভাত। আমাদের সুখ দুঃখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। —বাবা তুমি যে একেবারে পাকা বাবুর্চী হয়ে গেলে। বাঃ রান্না ঘরের চেহারাই পাল্টে দিয়েছ। দেখেছ একেই বলে ব্যাটাছেলের হাত। কিন্তু ওদিকে তো ধরে রাখা যাচ্ছে না প্রভাত। ছি ছি সারা পাড়া ঢিঢি হয়ে গেল। রাস্তার দিকের জানালায় দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে, সন্তোষ সন্তোষ করছে। গান গাইছে। রাজেনবাবুকে বলছে—চা পাঠাও। ওঘর থেকে তো সরাতে হবে।

--সরাবো কি করে ছোড়দা। দরজা খুললেই তো বেরিয়ে পড়বেন। সে তো আর এক বিপদ হবে। প্রভাত কাকার কথা শুনে মনে হল, জ্যাঠাইমা যেন বেড়াল। ছেড়ে দিলেই পালাবেন। বাবা বললেন--যেমন করেই হোক কায়দা করে, প্রয়োজন হলে বাই-ফোর্স, ওঘর থেকে বের করে অন্ধকার ঘরে পুরতে হবে। আর আমি লিখে দিচ্ছি, তুমি বরং শ্যামনগরে একটা টেলিগ্রাম করে দাও, ওর ভাই এসে নিয়ে যাক। এখানে তুমি পাগলকে রাখবে কোথায়? সেখানে তবু মাঠ ময়দান আছে, যা খুশি করে বেড়াক।

বাবু অবাক হয়ে আমার মুখে দিকে তাকিয়ে বললে—মা পাগল হয়ে গেছে দাদাভাই। ভোমলার মত। সন্তোষদার দোকানের সামনে ভোমলা বসে থাকে। কথার কথায় বলে—ভগবানের যেমন বরাত। আজ আর কিছু খাওয়া জুটলো না। ভগবানের বরাত কথাটা শুনলে বাবা খুব খুশি হন। ও তো প্রচ্ছন্ন সাধক। তোমরা কেউ বুঝবে না। এত বড় কথা যে বলতে পারে, সে সাধক। বাবা একদিন ভোমলাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেইদিন খাওয়া দেখেছিলুম। খাচ্ছে, খাচ্ছে, খেয়েই চলেছে। ইয়া তার স্বাস্থ্য, গায়ের চামড়া তেল চুকচুকে। এক হাঁড়ি ভাত শেষ। শেষে বললে—ভগবানের যেমন বরাত, একটুর জন্যে পেটটা ভরল না। সমস্ত রুটি শেষ, বাবার স্টকের আম শেষ, তবু ভোমলার পেট ভরল না। বাবা বললেন--কি বুঝলে। আমার অহঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। ও হল বামন অবতার, আমি হলুম রাজা বলী। মাত্র ত্রি-পাদ পরিমিত জমি চেয়েছিল। দিতে পারেননি। আমিও পারলাম না ওর পেট ভরাতে। সন্তোষদা মজা দেখেন। যেই বলেন, ভোমলা ফায়ার, ভোমলা তখন প্রথমে সামনে ঝুঁকে, তারপরই পেছন দিকে হেলে পড়ে, ফায়ারিং—এর শব্দ—দুম, ফটাস, দুম, ফটাস। সঙ্গে সঙ্গে রাজেনবাবু খুশি হয়ে চা, সন্তোষদা বিস্কুট, বিড়ি। ভোমলা বোমারুর মত মুখ করে রকে বসে থাকে। জানে, ফায়ারিং না করলে সারাদিন উপোস।

পাগল শুনেই বাবুর ভোমলার কথা মনে পড়েছে। বাবু রুটিটা হঠাৎ ছুঁড়ে ছাদে ফেলে দিল। একই সঙ্গে উড়ে এল দুটো কাক, দুটো শালিক। জোর ঝটাপটি। দু'পক্ষই শক্তিশালী। খেলি না কেন?—আর ভাল লাগছে না।—এই বললি খুব ভাল লাগছে। বাবু উদাসমুখে জিজ্ঞেস করল--দাদাভাই ওরা মাকে মারবে, না! --মারবে কি রে? মাকে কেউ মারে? ওপাশের ঘর থেকে মাঝের ঘরে আনবে। মাঝে অন্ধকার ঘরটা

বেশ নিরিবিলি, ঠান্ডা তাই না? —চল না দেখে আসি।

আমার খুব ইচ্ছে করছিল দেখবার। কিন্তু কেন জানি না মনে হল, বাবুকে আটকে রাখতে হবে। ধাক্কাধাক্কি হতে পারে, ঠ্যালাঠেলি হতে পারে। বাবুর দেখা উচিত হবে না।—কি দরকার ভাই ওসব অশান্তির মধ্যে! তারচেয়ে চল, ছাদের ওই ছায়া ছায়া জায়গাটায় গিয়ে বসি। ওই দ্যাখ একটা পাছাপাড় ঘুরি উড়ছে।

ঘুড়ির ব্যাপারে অন্যদিন বাবুর কত উৎসাহ। আজ যেন মিইয়ে গেছে। ঘুড়িটার দিকে তাকাল, কিছু বললো না। —আন্দে না, একতে বল তো? দু'জনে ছাদে এসেছি। সারি সারি টবে তেজী চন্দ্রমল্লিকা। কাঁকড়িকাটা ভেলভেটের মত ঝোলা ঝোলা পাতা। ছোট ছোট দুটো হলদে প্রজাপতি হই হই করে উড়ছে। নিমগাছের অসংখ্য ডালপালা হাত তুলে, ঢলে ঢলে যেন হরিনাম করছে। সকালে নিমগাছটা দেখলেই কেন জানি না নিমাইয়ের কথা মনে হয়। বহুদূর আকাশে একটা চিল উড়োজাহাজের মত ভাসছে। সকলেরই কত সুখ! পৃথিবীটা কত সুন্দর! যত দুঃখ সব আমাদের মনে। —জানিস বাবু আজ পূর্ণিমা। রাতে খুব চাঁদের আলো হবে। দেখবি কি মজা! বাবু হঠাৎ আমার বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই আমি জ্যাঠামশাইকে যেন দেখতে পেলুম। শীতের রবিবারে ছাদে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। রোদে দুটো পা। কালো চামড়ার ব্যান্ড দেওয়া চটি দু'পাটি একটু দূরে খোলা রয়েছে। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছেন। গায়ে বিস্কুট রঙের শাল। চওড়া কপালের দু'পাশে দড়ির মত শির, পাকিয়ে পাকিয়ে সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কোলের ওপর খোলা সুদ্ধ আধখানা কমলালেবু। সেই চটি দু'পাটি এখনও আছে। নিমগাছটা তখন ছিল পাঁচিলের মাথায় মাথায়। এখন পাঁচিল ছাড়িয়ে কোথায়, কত দূরে উঠে গেছে।

অন্ধকার ঘরের উত্তরের ছোট জানলাটা খুলচে পেছনের সেই ঘুটঘুটে সিঁড়িটার দিকে। যেটা নেমে গেছে পাতকোতলার শ্যাওলাধরা উঠোনের দিকে। সেই জানলায় জ্যাঠাইমার ফর্সা, টুকটুকে মুখ। ঘর থেকে বাবার দুটো বড় মুগুর, ডাম্বেল, কাঠের বড় আলনাটা বের করে এনে আমাদের বড় ঘরে রাখা হয়েছে। ওঘরে এখন শুধু জ্যাঠাইমা আর কুলুঙ্গিতে সিঁদুরমাখা মালক্ষ্মী, মা দুর্গার ছবি, একটা ফুটো শাঁখ, একটা তেলচিটে প্রদীপ। আর জানলার তলায় এক রাশ পুরোন, ড্যালা পাকানো তুলো। বাবা একটা তুলো ধোনা যন্ত্র উদ্ভাবন করছেন। যন্ত্রটা তৈরি হলেই এক রবিবার তুলোগুলো সব লেপ হয়ে যাবে।

বারান্দা দিয়ে যাকেই যেতে দেখছেন, তাকেই জ্যাঠাইমা বলছেন—ওরে আমাকে একটু বেরতে দে না। আমার যে অনেক কাজ পড়েআছে! সকলেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে, কেউ কিছু করতে পারছে না। করার সাহসও নেই। ঘরের তালা, চাবি পিসিমার কাছে। জ্যাঠাইমা মাঝে মাঝে একটু করে তুলো নিয়ে পিঁজে পিঁজে, জানলা দিয়ে ফুঁ করে উড়িয়ে দিচ্ছেন। পুরনো তুলো। ওজনে ভারি। বেশি দূর উড়তে পারছে না। সারা সিঁড়ি একটু একটু করে তুলায় ভরে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই

সিমেন্টের সিঁড়ি, গদির সিঁড়ি হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

বাবু জানলার বাইরে থেকে মার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। দু'বার মা, মা, বলে ডাকল। জ্যাঠাইমা একটু তুলো মুখের সামনে ফুঁ দেবার জন্যে ধরে রেখে বললেন—তুই তো ওদের দলে। সরে যা আমার চোখের সামনে থেকে বিটলে, শয়তান। কথাটা বাদ দিলে, জ্যাঠাইমার এই ভঙ্গিটা, আমার ইতিহাসের পাতায় নুরজাহানের ছবিটার মত। নাকের কাছে গোলাপ ফুলের বদলে, তুলো।

এই সেই জ্যাঠাইমা। মাএ কয়েক বছর আগে যেদিন প্রথম এ বাড়িতে এলেন—গোলাপী বেনারসী-পরা গোলাপী শরীর। ওপাশের ঘরে বসে আছেন। কে যেন আমাকে জ্যাঠাইমার নরম কোলে বসিয়ে দিয়ে বলে গেল—এই তোমার ছেলে। পাড়ার সব গ্রাম্য প্রতিবেশীরা যেন চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছে। আসছে যাচ্ছে। কত কথা। দরজার বাইরে, দুই বুড়িতে ফিসির ফিসির করে কথা হচ্ছে। কাদের বাড়ির কে জানে? এখনও ভুলিনি সেই কথা। একজন বলছে—আহা এমন বৌয়ের অমন বুড়ো বর! কি হবে মাগো। আর একজন খ্যানখ্যান করে হেসে বলছে—দেবরটার চেহারা দেখেছ! এইবার বুঝে নাও।

জ্যাঠাইমা মালাদিকে ডাকছেন—এই মালা, মালা। দরজাটা তোর মাকে খুলে দিতে বল না রে। মালাদি বললে—মা বাড়ি নেই। —কোথায় গেছে, তোর মামার সঙ্গে অফিসে? —অফিসে যাবে কেন? তোমার মাথাটা মাইমা একবারে খারাপ হয়ে গেছে। —তবে পোস্টাপিসে গেছে? —পোস্টাপিসে কি করতে যাবে? —টাকা জমা দিতে। ওই তো একটু আগে পুরনো বাসনঅলা ডেকে এ বাড়ির সব ঘটি-বাটি বিক্রি করে অনেক টাকা পেলি।—ওমা! কি মিথ্যে কথা! দাঁড়াও প্রভাত মামা আসুক।

—প্রভাত বুঝি তোদের বাপরে। প্রভাত বাবা, হি, হি।

জ্যাঠাইমার হাসিটা স্বাভাবিক হাসি নয়। কথা তো নয়ই। কি জানি মানুষ যে হঠাৎ কেমন করে পাগল হয়ে যায়। জ্যাঠাইমার কথা শুনে মালাদি ভীষণ চটে গেল। —দেখলি বিল্টু কি যাতা বলছে। পরের কথাটা চিৎকার করে জ্যাঠাইমাকে বলল—ছোট মামা আসুক বটেক। সব কথা বলব। জ্যাঠাইমা ফুঁ দিয়ে একটু তুলো উড়িয়ে দিয়ে বললেন—ছোটমামা! বাবা, বড় ভয় করছে, ওই ছেলেটার বাবা তো, যাঃ যাঃ তোর ছোট মামাকে আমি ট্যাঁকে রাখি।

মালাদিকে নিয়ে সদরের দিকে সরে গেলুম। বাবু গুম হয়ে বেনচিতে বসে আছে। বাড়িতে একজনও বড় মানুষ নেই। পিসিমা গেছেন অধীরবাবুর কাছে গদাইদাকে সঙ্গে নিয়ে, ভর্তির তদবিরের জন্যে। প্রভাত কাকা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, টেলিগ্রাম আরও কি কি সব করতে। মালাদিকে আজ বেশ বড় সড় লাগছে। শাড়ি পরেছে ফ্রক ছেড়ে।

আমরা সদরের দিকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। প্রথমে ভেবেছিলুম প্রভাত কাকা। উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। অনেকদিন পরে শরৎবাবু

এলেন।

গোলগাল চেহারা। আদ্দির পাঞ্জাবি। কালো চওড়া পাড়! ফিনফিনে ধুতি। আন্ডারওয়্যারের পটি ফুটে উঠেছে। পায়ের চকচকে কালো নিউকাট জুতো দুটো যেন চেয়ে আছে। মুখে সেই টিপি টিপি হাসি। আগে আরও দুপুরে আসতেন। জ্যাঠাইমার ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের ইজিচেয়ারে বসে সন্ধ্যে অবধি খুব গল্প চলতো। সিগারেটের পর সিগারেট। ঘরটা পোড়া তামাকের গন্ধ আর ফিকে ধোঁয়ায় ভরে যেত। কত হাসি, কত গল্প। জ্যাঠাইমার সম্পর্কে কি রকম যেন জামাইবাবু। মিঠি মিঠি ডাক—নন্দু, তোমার এই মনে পড়ে, তোমার ওই মনে পরে। তোমার কি সুন্দর গানের গলা। গাওনা একটা গান? জ্যাঠাইমা অমনি ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন—তোমায় ঠাকুর, বলবো নিঠুর, কোন মুখে? শাসন তোমার যতই গুরু ততই টেনে লও বুকে। শরৎবাবু অমনি মাথা নেড়ে নেড়ে হাতের আঙুলের আঙটি দিয়ে ইজিচেয়ারের হাতলে তবলা বাজাতে শুরু করতেন। গান শেষ হলে, জ্যাঠাইমার গালে টোকা মেরে বলতেন, দুষ্টু মেয়ে!

শরৎবাবুর সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটা কেমন যেন পা টিপে টিপে চোরের মতন। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে বাবার ভয়ে আমরা এইভাবে উঠি। ওপরে উঠে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন—জ্যাঠাইমা কোথায়? এই ভাবেই শরৎবাবু কথা বলেন। যত-না কথা বলেন, তার চেয়ে বেশি হাসেন। ভদ্রলোকটিকে দেখলেই রাগ ধরে যায়। জ্যাঠামশাইয়ের ইজিচেয়ারে কেন বসবেন? ওই চেয়ারটা কত বড় একটা স্মৃতি! কেন রবিবারে না এসে অন্যবারে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা জাঁকিয়ে বসে থাকবেন! জ্যাঠাইমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঘরে গেলেই, কেন ওঁর জলতেষ্টা পাবে! কেন আমাকে বলবেন—একটা পান নিয়ে এস তো সামনের দোকান থেকে!

আবার ফিস ফিসে গলায় প্রশ্ন করলেন—তোমার জ্যাঠাইমা কোথায়? কি উত্তর দেব! মালাদির মুখের দিকে তাকালুম। বাবু হঠাৎ বললে—মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শরৎবাবুর বিশ্বাস হল না, বাবুর কাছে সরে গিয়ে বললেন—মিথ্যে কথা বলতে নেই বাবা। মা কোথাও বেড়াতে গেছে বুঝি! বাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললে—না, না, ওই তো ওঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে। শরৎবাবু ঘাড় ঘুড়িয়ে বড় ঘরের দিকে তাকালেন। নিজের মনেই বললেন—সে কি! মাথা খারাপ হয়ে গেল! জানতে চাইলেন—কিরকম মাথা খারাপ! আমরা কিছু বলার আগেই বাবু বলল—ভোমলার মত নয়—সে আবার কে? শরৎবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—সে আবার কে? এবার মালাদি উত্তর দিল—সে একজন আছে বটেক।-তা হলে কার মত। কি করে বুঝলে মাথা খারাপ! মাথা খারাপ হলেই হল। মাথায় ছিট না থাকলে, হঠাৎ একবারেই মাথা খারাপ হয় নাকি! কই চলতো দেখি একবার।

বাবু বললে—প্রভাত কাকা ঘরে তালা দিয়ে রেখেছেন। -সে আবার কে হে? মালাদি বললে—প্রভাত মামা বটেক। —এই বলছে কাকা, এই বলছে মামা, মহা মুশকিল তো! শরৎবাবুকে ভীষণ বিব্রত মনে হল। আর ঠিক সেই সময়, জ্যাঠাইমা

দক্ষিণের ঘরের দিকের দরজায় গদাম গদাম করে কিল মারতে শুরু করলেন—তোরা, খুলবি কিনা বল, ডাক তোদের প্রভাত না কে তাকে। চালাকি পেয়েছিস তোরা, ভেবেছিস আমাকে ঘরে পুরে রেখে সব বিক্রি করে খাবি। আমি জজসাহেবের কাছে নালিশ করব।

শরৎবাবু ভয় ভয় মুখ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন—আমি তাহলে চলি। সিঁড়ি দিয়ে চোরের মত নামছেন।

জ্যাঠাইমা বলছেন—সব মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরবি। শরৎবাবু নামতে নামতে পেছন ফিরে তাকালেন, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞস করলেন—বেরিয়ে আসবে না তো। শরৎবাবুর কথা চাপা পড়ে গেল দরজায় কিল, চড়, লাথির প্রচন্ড শব্দে।

আমরা তিনজনেই জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম—শরৎবাবু হন হন করে হেঁটে চলে যাচ্ছেন দূর থেকে দূরে।

উনুনে আগুন পড়েছে। টিনের চাল গলে হুহু ধোঁয়া উঠছে সন্ধ্যার ম্রিয়মাণ আকাশের দিকে। নিচের বাগানে একগাদা পিঁপড়ের ডানা বেরিয়েছে মরবার জন্যে। হুহু করে ওপর দিকে উঠছে। থিরিথিরি পাখার কাঁপন। ডুমুর গাছে আমার বাঁধা কলসিটার মুখের কাছে বসে আছে দোয়েল। দোয়েলই বোধহয় সবশেষে বাসায় ঢোকে। খুব শিস দিচ্ছে। পিড়িক পিড়িক করে ন্যাজ নাচাচ্ছে। মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে না পেরে ছোঁ মেরে উড়ন্ত পিঁপড়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

পাশের বস্তিবাড়িতেও আগুন পড়েছে। চতুর্দিক থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। পশ্চিম আকাশটা আগুনে লাল থেকে ক্রমশ বেগুনী হয়ে আসছে। পেয়ারা গাছের পাতাগুলো জমাট কালো হয়ে উঠছে। উওরের সবজি বাগান অঞ্চলে টিপ টিপ করে আলো জ্বলে উঠছে। ওপাশের বাড়ির গোয়ালে গরু ডাকছে হামমা, হামমা করে। কে এক মহিলা বলছেন—যাচ্ছিরে মঙ্গলা, যাচ্ছি।

ছাদে ওঠার সিঁড়ির ধাপে বসে, শাড়িটাকে হাঁটুর ওপরে তুলে মালাদি প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে উরুর ওপর হাত ঘষে ঘষে। প্রভাত কাকা পাতকোতলায় হুড় হুড় করে জল ঢেলে চান করছেন, আর মাঝে মাঝে ধেই ধেই করে নাচছেন। সঙ্গে গানও আছে—গোদা রোটি খাও, হরিকে গুণ গাও। আরে গোদা রোটি খাও ভাই। পিসিমা আটা মাখছেন। বাবু বসে আছে সামনে।

প্রভাত কাকা ওপরে এলে জ্যাঠাইমার ঘর খোলা হবে। ঠাকুরের কাছে প্রদীপ দেওয়া হবে। ফুঁটো শাঁখ বেজে উঠবে। প্রভাত কাকা বলেছেন, জ্যাঠাইমাকে হিপোনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। মনটা ভীষণ বিষন্ন হয়ে আছে। খেলার মাঠ থেকে শেষ ছেলেটিও চলে গেছে। সারা পাড়াটা যেন গুটিয়ে আসছে একটু একটু করে। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। সকালে প্রভাত কাকার

সঙ্গে গঙ্গায় চান করতে গিয়ে ইটে ঠোক্কর খেয়ে নখটা একটু উঠে গিয়েছিল। তার ওপর ঢুকেছে গঙ্গা মাটি। জায়গাটা একটু একটু করে ফুলে উঠছে।

প্রভাত কাকার জলঝরা শরীরটা ওপরে উঠে এল। হাত-পা ছুঁড়ে, শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে জল ঝাড়লেন। একটা মাত্র গামছা, গা মুছবেন কি করে। ভিজে গামছা ছেড়ে কাপড় পরলেন। পাতলা চুলে হাত বুলিয়ে জল সুদ্ধই কপালের ওপর সমান করে দিলেন। আমাদের স্কুলের ফার্স্টবয়ের মত দেখাচ্ছে। বারান্দা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গামছা নিঙড়োলেন। ছর ছর করে জল পড়ল নিচের উঠোনে। চ্যাঁক চ্যাঁক শব্দ করে একটা ছুঁচো ছুটে পালালো।

গামছাটা দড়িতে মেলে দিয়ে প্রভাত কাকা মালাদিকে বললেন—দে, সলতে দে, দেশলাই দে। কাপড়টা ভিজে গিয়ে পাছার সঙ্গে জায়গায় জায়গায় লেপ্টে গেছে। সলতে আর দেশলাই হাতে প্রভাত কাকা জ্যাঠাইমার ঘরের সামনে। এইবার তালা খুলবেন। আমরা সব দম বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি ভয়ে ভয়ে। কি হয়, কি হয়। বাবু লেপ্টে আছে আমার গায়ের সঙ্গে। হাতের ওপর নিশ্বাস পড়ছে। গরম। ভ্যাট করে একটা শব্দ হতেই আমরা চমকে উঠেছি। জোর শব্দ।

না, আমরা ভয়ে ছিলুম বলেই ভয় পেয়েছি। শব্দটা ঘরে হয়নি। হয়েছে রাস্তায় সন্তোষদার দোকানে। সোডার বোতল খোলার শব্দ। বাবু আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তার হাত আবার আলগা হয়ে এল। প্রভাত কাকা তালা খুলেছেন। এইবার শিকল নামছে। এখুনি দরজা খুলে যাবে। তারপর যে কি হবে!

প্রভাত কাকা দরজাটা ঠেললেন। খুলল না। এবার জোরে ঠেললেন, তাও খুলল না। ভেতর থেকে জ্যাঠাইমা খিল তুলে দিয়েছেন। প্রভাত কাকা ডাকলেন বৌদি দরজা খুলুন। কোনও সাড়া নেই। —বৌদি, বৌদি। প্রভাত কাকা যেন একটু ভয় পেয়েছেন। নিজের মনেই বললেন—কি হল! গলায় দড়ি দেননি তো!

ভর সন্ধ্যেবেলা। গলায় দড়ির নাম শুনে বাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ডাকল—দাদাভাই! প্রভাত কাকা এইবার দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে ডাকছেন—বৌদি, বৌদি। হঠাৎ ভেতর থেকে জ্যাঠাইমা বলে উঠলেন—কেমন মজা, কেমন মজা। এইবার কি করে তোমরা ঢোক দেখব!। ভেবেছিল রাত হলেই ছুরি হাতে ঢুকে আমাকে খতম করে দেবে তাই না। অত সহজ নয়! আমিও বাঁচতে জানি।

—দরজা খুলুন বৌদি। খাবার এনেছি। প্রভাত কাকা মিষ্টি করে বললেন। জ্যাঠাইমা বললেন ও আর এক ষড়যন্ত্র। খাবারে করে বিষ দেবে ভেবেছ। তা হচ্ছে না। —খাবার নয়, খাবার নয়, পাঠবাড়ির প্রসাদ এনেছি, গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদ। প্রসাদ খেতে হয়, না করতে নেই।

হঠাৎ ঠকাস করে খিলটা খুলে গেল। আমরা দৌড়ে রান্না ঘরের দিকে পালাবার জন্যে প্রস্তুত। জ্যাঠাইমা হুট করে বেরিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন। প্রভাত কাকা বুক আর দু'হাত দিয়ে আটকে ফেললেন একটু ধ্বস্তাধস্তি মত হয়ে গেল। জ্যাঠাইমার

হাতের চুড়ি বেজে উঠল। প্রভাত কাকা কায়দা করে ফেলেছেন। ঘরের ভেতর থেকে বললেন—ছোড়দি শিকলটা তুলে দিন।

অন্ধকার ঘরে দেশলাইয়ের আলো কেঁপে উঠল। প্রভাত কাকা গান গাইছেন—হরের্নামৈব, হরের্নামৈব কেবলম। মনে হল প্রদীপটা জ্বলে উঠেছে। প্রভাত কাকা নাভির কাছ থেকে ভীষণ একটা শব্দ তুলছেন—হুঁউ, হুঁউ। সমস্ত বাড়িটা যেন কেঁপে উঠছে। শব্দটার এমনই শক্তি, আমাদেরই শরীর অবশ হয়ে আসছে, বারান্দা থেকে আমরা সব পায়ে পায়ে, গুটি গুটি দরজার কাছে সরে এসেছি, প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় বন্ধ ঘরে প্রভাতকাকা কাপালিকের মত গর্জন করছেন। জ্যাঠাইমা মাঝে একবার একটু হেসে উঠেছিলেন। এখন আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। নিস্তব্ধ ঘরের বাইরে আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করছি—কি হচ্ছে ঘরের ভেতরে। বাইরে সন্তোষদার দোকানে রেডিওতে হিন্দি গান হচ্ছে।

দক্ষিণের ঘরের মেঝেতে আমাদের বিছানাটা গোল করে গুটনো রয়েছে দেয়ালের পাশে। গাছের গুঁড়ির মত সেই বিছানায় আমরা পাশাপাশি বসে আছি। আমার ডানপাশে মালাদি, বাঁ'পাশে বাবু। গদাইদা বসে আছে বাইরের বেনচিতে। মালাদি হঠাৎ আমার গালে একটা চুম, খেয়ে বললে—লক্ষ্মীছেলে। গালটা একটু ভিজে ভিজে লাগল। কেন মালাদি হঠাৎ চুমু খেল! কেনইবা লক্ষ্মীছেলে বলল! সারা শরীরটা অদ্ভুত একটা ভাললাগার ভাবে সিরসির করে উঠল। চুমু তো ভালবাসার লক্ষণ। কেউ ভালবাসলে কত ভাল লাগে। মালাদি বললে—পড়তে বসবি না?

পড়তে তো বসতেই হবে। কিন্তু বসি কি করে! মনটা বড় খাপছাড়া হয়ে আছে। মালাদি বললে—পড়তে বস ভাই, তা না হলে ছোট মামা এসে আবার বকবেন! মালাদি মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো একটু খাবলা-খাবলি করে দিতে দিতে বলল—তোর কি ঘন চুলরে! পায়ের আঙুলের মাথাটায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জ্যাঠাইমা ঘট ছুঁড়ে মেরে বলেছিলেন—খোঁড়া হয়ে যাবি। পাটা সেপটিক হয়ে তাই হবে না তো। কাকে জিজ্ঞেস করি। একমাত্র ভগবানই বলতে পারেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রভাত কাকা ঘরের ভেতর থেকে বললেন—ছোড়দি দরজা খুলুন। আমরা তখন পড়তে বসে গেছি। মাঝখানে হ্যারিকেন, এক পাশে আমি আর এক পাশে গদাইদা। পড়া মুখস্থর গুনগুনুনি থেমে গেল। দৌড়ে পালাতে হবে নাকি। বাবু গোল করে গুটনো বিছানার ওপর উপুড় হয়ে ঘুমচ্ছে অঘোরে। পিসিমা দরজাটা খুলে দিলেন। আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। প্রভাত কাকা দরজার দুটো পাল্লাই হাট করে খুলে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। ঘর অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেছে। সলতে পোড়ার মৃদ্ একটা গন্ধ এ ঘরে ভেসে এল। এঘর থেকে একটু আলো ওঘরে পড়েছে। প্রভাত কাকা ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন। বুকটা সামনে চিতানো। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

আমরা উঁকি মেরে দেখলুম, ঘরের মাঝখানে মেঝেতে মাদুর। মাদুরের ওপর

জ্যাঠাইমা ধ্যানস্থ। সাদা কাপড়। মাথায় অল্প ঘোমটা। মীরাবাঈয়ের মত দেখাচ্ছে। পাশে একটা দণ্ড কমণ্ডুল থাকলে দৃশ্যটা সম্পূর্ণ হত। আমরা অবাক হয়ে প্রভাত কাকার দিকে তাকিয়ে রইলুম। তিনি যেন সিংহীকে শান্ত করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন। পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন দরজা খোলা থাকবে প্রভাত।—হ্যাঁ খোলাই থাকবে ছোড়দি। আর কোনও ভয়ে নেই। এবার উনি ইচ্ছে করলে বাথরুমে যেতে পারেন। জিজ্ঞেস করে দেখুন। -কিছু হবে না তো প্রভাত। -কিচ্ছু হবে না।

পিসিমা ভয়ে ভয়ে দরজার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—মেজবৌদি, ও মেজবৌদি, তুমি বাইরে যাবে নাকি। আমরা আবার বসে পড়েছি। প্রভাত কাকা আমাদের কাছে এসে বসেছেন। পিসিমা বারে বারে ডাকছেন—মেজবৌদি, ও মেজবৌদি। জ্যাঠাইমা উঠে দাঁড়ালেন। টলছেন, যেন নেশা করেছেন। আমরা প্রভাত কাকাকে জিজ্ঞেস করছি—মেসমেরিজম? প্রভাত কাকা মাথা নাড়ালেন। নামটা পাল্টে দিয়েছেন। সেই যেমন বিনয়কাকার নামটা করে দিয়েছিলেন সিঙ্গারা। —না নাম পাল্টাইনি। একজন সাধিকাকে বসিয়ে দিয়েছি ভেতরে। দেখি কতক্ষণ তিনি থাকেন।

জ্যাঠাইমা দেয়াল ধরে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। প্রভাত কাকা আদেশের স্বরে বললেন—যা করার করে নিন। এখন আপনার ঘুমোবার সময়।

বাবাকে কখনও এত ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখিনি। হাতের সাদা ঝোলাটা, ছাতাটা লটরপটর করছে। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ কালো হয়ে আছে।—কেমন আছিস। আঙুলের কথা ভুলে বললাম-ভাল আছি। আপনি কেমন?—ওই একরকম। জুতো খুলতে খুলতে পড়ে যাবার মত হচ্ছিল, দেয়াল ধরে সামলে নিলেন। ঘরে ঢোকার আগে একটু থমকে দাঁড়ালেন। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন—খবর কি?—না খারাপ নয় ভালই। প্রভাত কাকা হিপনোটাইজ করে রেখেছেন।—বলিস কি! সত্যি সত্যি হিপনোটাইজ করা যায়! বিশ্বাস হয় না। কোন ঘরে রেখেছে?

—অন্ধকার ঘরেই আছেন। ওই তো মশারির মধ্যে, শুয়ে আছেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—দরজা খোলা! সে কি রে! অন্য দিন উত্তরের ওই অন্ধকার ঘরে ঢুকে বাবা জামা কাপড় ছাড়েন। আজ দক্ষিণের বড় ঘরেই আলনা। জামা, কোট, কাপড় আজ সব ওইখানেই ঝুললো। একটা মুগুর একটু কাত হয়ে ছিল। সোজা করে রাখলেন। কুলুঙ্গিতে চিরুনিটা বুরুশের ওপর ছিল না। চিরুনিটা বুরুশে গুঁজে রাখলেন। একটা পেয়ারা ডাল টিনের চালের ভেতর আটকে ছিল, সেটাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন—যাও হাওয়া খাও। শিশির মাখো।

চেয়ারে উবু হয়ে বসে চা খেতে খেতে বললেন-– যাও আজ তোমাদের পড়ার ছুটি। ইস্কুল খুলছে কবে? খবর নিয়েছ—এখনও গোলমাল মেটেনি। স্কুল কমিটি প্রাণধনবাবুকে হেডমাস্টার করেছে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিলেন—ছিঃ হেডমাস্টার মশাই বল। তাহলে তো মিটেই গেছে। —না মেটেনি। ছাত্র কমিটি হর্ষবর্ধন বাবুকে করেছে। প্রাণধনবাবু হেডমাস্টার মশাইয়ের চেয়ারে বসলেই ছেলেরা হর্ষবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রাণধনবাবুর কোলে বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করছে, চলবে না, চলবে না। প্রাণধনবাবু রোগা, মোটা হর্ষবাবুর চাপে যেই চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছেন, হর্ষবাবু জাঁকিয়ে বসে বলছেন, আমি হেড। আজ শুনলুম বোম মেরেছে ছেলেরা।

—সে কি! শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটা কি ধরনের অসভ্যতা।

—আজকে স্কুলের মাঠে পুলিস বসে গেছে।

বুঝেছি ওই দাঙ্গার পর থেকেই বোম আর ছুরিটা খুব চালু হয়ে গেছে। তা না হলে কেউ ভাবতে পারে বিকেল বেলা, প্রকাশ্য দিবালোকে মোহিতবাবুর ছোট ছেলেটাকে ছুরি মেরে খুন করে দিলে। ওই নামকাওয়াস্তে স্কুলটা থাক, পড়াশুনা বাড়িতেই চেপে করে যাও।

চাঁদের আলোয় দুটো সাদা পেঁচা ইলেকট্রিক তারে এসে পাশাপাশি বসেছে। তারের লম্বা ছায়া পড়েছে রাস্তায় ওপর। কাদের বাড়ির রেডিওতে ভারি সুন্দর সেতার বাজছে। সামনে বাড়ির ভাঙা ছাদে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল হয়েছে। হাওয়া যখন জোরে বইছে সনসন করে একটা শব্দ উঠছে।

এতক্ষণে প্রভাত কাকা এলেন। রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিলেন, রাতের খাওয়ার আয়োজন নিয়ে। বাবা বললেন—বস। টেলিগ্রামটা পেল কিনা বুঝতে পারছিনা হে। ভেবে ছিলুম আজই এসে পড়বেন। ঠিকানাটা ঠিক আছে তো। —ঠিকানায় কোনও ভুল নেই। পোস্টাপিস তো আর আগের মতন নেই। হয়তো সন্ধ্যেবেলা পেয়েছে। আসতে আসতে কাল সকাল!

—তুমি কি ভাবে ঠান্ডা করলে? হিপনোটাইজ? বিশ্বাস হয় না বাপু। তোমার যদি এত শক্তিই থাকত তুমি এই ভাবে পড়ে পড়ে মার খেতে না। প্রভাতকাকা মাথাটা সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বাবার কানে কানে ফিস ফিস করে কি বললেন, ঠিক শুনতে পেলুম না। বাবা আতঙ্ক মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন—বেশি দাওনি তো! দেখ মাত্রা ঠিক না থাকলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। দু'জনেই পড়ে যাব খুনের দায়ে।

প্রভাত কাকা চেয়ারে শরীরটা এগিয়ে দিয়ে হাতের দুটো আঙুল নস্যির টিপ ধরার মত করে বললেন—ছোট্ট মটরের দানার মত এতটুকু। আমি দু'ভরি হজম করে ফেললুম, কি যে ভয় পান আপনি।—তোমার কথা বাদ দাও প্রভাত, তুমি স্বয়ং নীলকণ্ঠ।

প্রভাত কাকা বললেন—আমি কাল থেকেই মাজন কোম্পানি শুরু করতে চাই। কাল দিন ভাল। নাম ঠিক হয়েছে দাঁতুথ পাউডার। এদের সব চাকরি দিয়ে দিয়েছি—

সপ্তাহে চার টাকা। আমি ক্যানভাসার।—তুমি ক্যানভাস পারাবে না প্রভাত। শক্ত কাজ। প্রথম প্রথম ট্রেনে ঘুরতে হবে।—কি ভাবেন ছোড়দা আমাকে। এমন কোনও কাজ আছে যা আমি করিনি। ঘটকালি, জ্যোতিষী, কয়লার দোকান, সাইকেলের দোকান। চোরাই মালের কারবারী। বলে দিলে রাজাবাজার ট্রামডিপোর উল্টো দিকের ফুটপাথে গিয়ে দেখবেন একটা লোক নীল রুমাল দিয়ে ডান গাল মুছছে, তাকে এই সাদা প্যাকেটটা দেবেন, মেটিয়াবুরুজে গিয়ে দেখবেন একটা লোক হাতের তালুতে সিগারেট ঠুকছে তাকে এই কালো প্যাকেটটা দেবেন। লোকটি মানে কারবারের মালিক একদিন খুন হয়ে গেল আর আমার চাকরিটা চলে গেল।

বাবা চুক্ করে মুখে একটা শব্দ করলেন—আমি কি বলেছি তুমি কাজকে ভয় পাও? পরিশ্রমকে ভয় পাও? ক্যানভাসিং একটা আলাদা লাইন, আলাদা আর্ট। সে ছিলেন বিল্টুর ছোড়দাদু। সাহেবদের মত দেখতে ছিল। বিলিতী পোশাক পরে বাঁকা করে টুপি লাগিয়ে মুখে পাইপ দিয়ে যে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ হাসিল। ইংরিজী কি? সায়েব বাচ্চ হার মেনে যেত। তোমার একটা অসুবিধা কি জান, তোমার ওই সামনের দাঁত দুটো। ওই ঢকঢকে দাঁত নিয়ে তুমি কি করে বলবে, এই মাজনে দাঁত মাজলে, দাঁত ভাল হয়।

প্রভাত কাকা চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—কি বলছেন ছোড়দা। তবে দেখুন। প্রথমে জিভ দিয়ে সামনের এই দুটো দাঁতকে ঢকঢক করে নাড়াব। মনে করুন আপানি প্যাসেঞ্জার। আমি ক্যানভাসার;

প্রভাত কাকা সামনের গজাল দাঁত দুটোকে কিছুক্ষণ নাড়িয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—সর্বনাশ, সর্বনাশ, সর্বনাশ। বাবা চমকে উঠেছিলেন।—সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা। দাঁত থাকতে বুঝিনি দাঁতের মর্যাদা। তাই তো আমার এই অবস্থা। ঈশ্বর দিয়েছিলেন হাতির মত দাঁত, পারিনি তাই রাখতে, সব কটা হয়ে গেছে কাত। আমি সেই জ্ঞান পাপী, এসেছি যীশুর মত বিলতে প্রেম। জেনে রাখুন—দাঁত যদি করে উৎপাত, দীতুথ লাগান, দাঁত সেরে যাবে চটপট। দাঁতের ব্যথায় কেন করেন ছটফট, এনেছি বিদেশী মাজন দীতুথ পাউডার।

বাবা বললেন—দ্যাখো কি হয়। মন্দ হয়নি, তবে তোমার ওই দাঁত দুটো দুর থেকে সকলে কি দেখতে পাবে প্রভাত।

—খুব পাবে ছোড়দা, এর সাইজ কি কম ভাবেন। প্রায় হাতির দাঁতের কাছাকাছি যায়। প্রভাত তো দাঁতের জন্যেই বিখ্যাত, এইবার বিখ্যাত হবে মাজনের জন্যে। দাঁত যদি বাজারে না নেয় তুলে ফেলব। কতক্ষর লাগবে, এক সেকেণ্ডের ব্যাপার।

—না, না দাঁত তোলার অনেক ঝামেলা, সে আবার ডেন্টিস্ট লাগবে, অনেক টাকর ধাক্কা।

—ডেন্টিস্ট। প্রভাত কাকা হাসলেন—ডেন্টিস্ট তো আমি নিজে। এই পাশের দাঁত দুটো তো আমি নিজে তুলেছি। বলুন না আপনার সব দাঁত আমি এক্ষুণি তুলে

দিচ্ছি। এক একটা এক সেকেন্ডে।

—কিভাবে তুলবে? ঘুসি মেরে!—না না সিল্কের শক্ত সুতো দিয়ে দরজার শিকলে একটা দিক বাঁধবো, আর একটা দিক ফাঁস লাগিয়ে দাঁতে। তারপর ঝট করে পেছন দিকে শুয়ে পড়ব, গোড়াসুদ্ধ দাঁত উঠে চলে আসবে।

—বল কি, অতই সোজা!—বিশ্বাস করছেন না, দেখিয়ে দেব। সুতোতে কি না হয় ছোড়দা, জীবন বেরিয়ে আসে, দাঁত বেরুবে না। বসুন আমি একটা তুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। বাবা একটু আতঙ্কিত হয়ে বললেন—কার দাঁত তুলবে। তোমার নিজের!—না আমারটা তুলতে চাইছি না। গজদন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ!—আর সৌভাগ্য দেখিও না প্রভাত। প্রভাত কাকা মোটেই হতাশ না হয়ে বললেন—গজদন্তে, গজ লাভ হয়।—তা হয়, যেমন তোমার হয়েছে। এই সংসারটা গজের বাবা। বাবা চেয়ারটা শব্দ না করে সরিয়ে উঠে পড়লেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ। প্রভাত কাকা বালিস বগলে ছাদে চলেছেন শুতে। মাদুর একটা পাতাই আছে। সারাদিন রোদ খাবার পর এখন চাঁদের আলো মাখামাখি। বাবা ডাকলেন—প্রভাত। খুব ঘুম পেয়েছে? প্রভাতকাকা ঘুরে দাঁড়ালেন—না ছোড়দা।—একটু কাজ ছিল? খুব সিক্রেট। ওরা সব ঘুমিয়েছে।—হ্যাঁ সব ফ্লাট।—তুমি তাহলে বারান্দার দিকের দরজা দুটো দিয়ে দাও।

বাবা বিছানায় বসে বসে নির্দেশ দিচ্ছেন। মশারিটা গুটিয়ে পাকিয়ে ওপরে তোল। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। আঙুলটা কট কট ঝনঝন করছে। ভয়ে বলতে পরছি না। বললেই, বিনা অনুমতিতে গঙ্গার চান ধরা পড়ে যাবে। সবচেয়ে খারাপ লাগে, বাবা যখন পয়সার কথা তোলেন—নাও আবার একগাদা খরচা। খিদেটা চাপা যায় না, তাই খাই খাই করি। দাঁত চেপে যন্ত্রণা চাপা যায়। চোখের সামনে দিয়ে সেই লোকটি যেন চলে যাচ্ছেন, যার একটা পা কাঠের।

বাবা বলছেন—বালিসটা বগল থেকে নামাও। বগলটা আলগা করতেই প্রভাত কাকা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেইখানেই পায়ের কাছে শব্দ করে বালিসটা পড়ল। নিজের মাথার বালিসের তলা হাতড়ে বাবা এক গোছা চাবি বের করলেন।

ঘরের পূর্ব কোণে পর পর তিনটে স্টিল ট্রাঙ্ক। ওপরের দুটো একাই নামিয়ে ফেললেন। নিচেরটা ওরই মধ্যে নতুন। অরিজিন্যাল রঙ লতাপাতা ডিজাইন অস্পষ্ট হয়ে এলেও বোঝা যায়।—হ্যারিকেনটা আন তো প্রভাত। প্রভাত কাকা হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বাক্সটার সামনে বসে বাবা একের পর এক চাবি লাগাচ্ছেন। শেষ চাবিটায় খুলে গেল। ডালাটা ওঠালেন। ক্যাঁচ করে চমকে দেবার মত একটা শব্দ হল। সারা ঘরটা ভরে গেল পুরনো কালের একটা অদ্ভুত গন্ধে। ছাদের আলসেতে কর্কশ গলায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। বহু দুরে গোটা কতক কুকুর খুব সোরগোল করে উঠল।—মাদুরটা পাততো প্রভাত।

একে একে সব জিনিস বেরুচ্ছে। নীল একটা বেনারসী, সোনার সুতো দিয়ে

নকসা তোলা। বড় হাতা নীল ব্লাউজ। রেশমী রঙের চকচকে একটা সায়া। কোমরে লাগানো সাদা দাড়ির একটা দিক এঁকেবেঁকে মেঝের ওপর পড়েছে। পুরো হাতা নীল সোয়েটার। সিল্কের পাঞ্জাবি। কালো একটা ওয়েস্ট কোট। পুরোন দিনের সমস্ত স্মৃতি বেরিয়ে আসছে। ওই বেনারসী ওইরকম পাট করাই থাকবে। কেউ পরবে না। ওই নীল সেয়েটারে মার ফর্সা গোল হাত আর কোনদিন আকৃতি দিতে ঢুকবে না। মার সেই লম্বা লম্বা হাতের আঙুল! অনামিকায় পোখরাজের জ্বল জ্বলে আংটি! ওই সিল্কের পাঞ্জাবি—বোধহয় বাবার বিয়ের পাঞ্জাবী। সব শেষে বেরিয়ে এল বর্মার তৈরি ঝকঝকে কালো সেই গোল বাঁশের বাক্সটা সারা গায়ে লতাপাতার কাজ। রেঙ্গুন থেকে জ্যাঠাইমা এনেছিলেন। বেতের তৈরি সুটকেসটা এখন এই জ্যাঠাইমার দখলে।

সমস্ত জিনিস হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে গোল বাক্সটা বাবা ঘরের মাঝখানে সাবধানে রাখলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। যেন পবিত্র একটা আধার। গলার স্বর শুনে মনে হল যেন বহু দূর থেকে বলছেন—প্রভাত একটা পেসিল আর কাগজ নিয়ে বসতো। আমার মনে হয় কাল সকলেই ওর বড় ভাই এসে পড়বেন কারুর সম্পত্তি মেরে দিয়েছি, এ অপবাদ আমি শুনতে রাজি নই।

খাতা আর পেনসিল হাতে গম্ভীর মুখে প্রভাত কাকা বসলেন। বাক্সর ডালাটা খুলতে খুলতে বাবা বললেন—এর মধ্যে রেঙ্গুনের মেজবৌদির সমস্ত গয়না আছে। যক্ষের মত আমি আগলে রেখেছি। এত দুর্দিনেও একটার গায়ে হাত পড়েনি। মেজদার কাছে থাকলে সব শেষ হয়ে যেত। খেয়ে আর খাইয়ে উড়িয়ে দিত। তুমি তো জানই, কি মেজাজের মানুষ ছিল।

একটা লক লকে সরু হার ধীরে ধীরে হাতের আকর্ষণে ওপরে দিকে উঠছে। আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বাবা বলছেন—এসব পূণ্য স্মৃতি, মনুমেন্ট, বুঝলে প্রভাত! একি বেচে খাবার জিনিস, না বাঁধা দেবার জিনিস। আমি চোখের সামনে তাদের দেখতে পাচ্ছি। বাবার গলাটা ভীষণ ভারি শোনাল।—নাও লেখ, আইটেম নম্বর ওয়ান্ মপচেন উইথ লকেট। হারটা বাক্সর ডালার ওপর রাখলেন।—আইটেম টু প্রজাপতি হার, ফিটেড উইথ রুবি, তিন একজোড়া সাপবালা, চার, ব্রেসলেট, পাঁচ টায়রা ফিটেড উইথ ডায়মণ্ড, ছয়, চুড়ি বারো গাছা, সাত, নবরত্ন আংটি।

তালিকায় গহনার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এদিকে রাতও বাড়ছে। শেষ জিনিস, হীরে বসান একটি নাকছাবি। নাকছাবি হাতে নিয়ে দু-আঙুলে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তারপর টুপ করে বাক্সর মধ্যে ফেলে দিলেন।

—দাও লিস্টটা দাও। তোমার সামনে মিলিয়ে সই করে রাখলুম, তুমিও একটা সই করে দাও, উইটনেস, সাক্ষী। কি ভেবেছিলুম জান প্রভাত, মেজদার ছেলেটার জন্যে এসব আগলে রাখব। বলা যায় না, আমি আজ আছি কাল নেই। এ সব সোনা তুমি পাবে কোথায়। পিওর গিনি গোল্ড। সে যুগের কাজ। পান, নেই বললেই চলে।

আমাকে সব ভুল বোঝে জান। বলে, স্বার্থপর, কঞ্জুস, চামার—আমি নাকি সব মেরে দেবার তালে আছি। সবই কানে আসে হে। আরে আমার সংসারই নেই, কার জন্যে মারব। হিসেব, হিসেব সে তো তোদেরই ভবিষ্যতের জন্যে রে। যাও তোমাদের জিনিস তোমরা বোঝ। মেজদার ছেলেটার এডুকেশানের কি হবে কে জানে!

একে একে সব জিনিস উঠছে। বেনারসীর ভাঁজ থেকে একটা গোল ন্যাপথলিন গড়িয়ে গেল। নীল সোয়েটারটা হাতে নিয়ে বাবা বললেন—মনে পড়ে প্রভাত, সেই জামতাড়ায় যাবার আগে, তুমি আর আমি বিন্টুর মার জন্যে কিনেছিলুম। এখনও নতুনের মত আছে। যত্নে রাখলে কতদিন থাকে দেখেছ।

প্রভাত কাকা সোয়েটারের ঝুলে থাকা হাতাটা স্পর্শ করে বললেন—এর সঙ্গে সেই হ্যান্ড গ্লাভস কেনা হয়েছিল, সে দুটো কোথায় ছোড়দা।—আছে, আছে, সব আছে। চৌকো একটা কাগজের বাক্স খুলে মার দস্তানা দুটো বের করলেন। —একটা, দুটো জায়গায় একটু ফুটো করে দিয়েছে হে। উলের জিনিস রাখা বড় শক্ত।

মার হাত দুটো নেই, দস্তানা দুটো আছে, মার শরীরটা নেই, মার শাড়ি রয়েছে। জামাতাড়া জায়গাটা আছে, প্রতি বছরই শীত আসে, মার সোয়েটার আছে, সেই পাহাড়ের পাশে মাঠটাও আছে যে মাঠে ভোরবেলা বেড়াতে গিয়ে মার পায়ের উপর দিয়ে কুচকুচে কালো একটা সাপ চলে গিয়েছিল, কেবল সেই দিনটাই আর আসবে না ফিরে।

বাবা বলছেন—সোয়েটারের উলটা দেখছ প্রভাত, যেমন নরম তেমনি গরম। এসব উল আর পাবে কোথায়!

মেঘলা, মেঘলা সকাল। কোনরকমে একবার এক ফাঁকে একটু রোদ বেরিয়েছিল। তারপর সেই যে মুখ লুকিয়েছে আর দেখা নেই। সারা আকাশে কোদালে মেঘ। উওরের বারান্দায় দাঁড়ালে বেশ বোঝা যায় শীত এসে গেল। একটা দুটো শিউলি ফুল ফুটতে শুরু করেছে। কখন যে ফোটে, কখন যে ঝরে পড়ে হলুদ মুখটি মাটিতে গুঁজে! কেন জানি না কেবলই মনে হচ্ছে, দূরে কোথাও সানাই বাজছে ভোরের করুণ সুরে—বাবুল মেরা নইহার ছুট গায়ে। হয়তো বাজছে না, কিম্বা বাজছে।

চা খেতে খেতে বাবা বললেন—কই এখনও তো ওঁরা এলেন না। আকাশের যা অবস্থা এখুনি হয়ত বৃষ্টি এসে যাবে।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় সামনের ভাঙা ছাদের বড় বড় জঙ্গলে খসখস শব্দ উঠছে, ভাঙ্গা ইটের ফাঁক থেকে ধুলো উড়ছে। আকাশের চাপা আলোয় নিচের রাস্তাটা ভীষণ সাদা দেখাচ্ছে। দূরে ঠুং, ঠুং করে একটা রিকসা আসছে। আর একটু কাছে আসতেই আরোহীদের চিনতে পারলুম। জ্যাঠাইমার বড় ভাই, আমার বড়মামা আর মাসিমা আসছেন। জানলার কাছ থেকে চাপা গলায় বললুম—ওঁরা আসছেন। বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—তোমার প্রভাত কাকাকে ওঘরের দরজাটা বন্ধ করতে বল।

আনন্দ হচ্ছে—মাসিমা আসছেন। বাড়িটা বেশ জমজমাট হবে। জ্যাঠাইমার ছোট

বোন। রঙে একটু ময়লা বলেই বোধহয় জ্যাঠাইমার মত অহঙ্কারী নন। এর আগে একবার একমাস এ বাড়িতে ছিলেন। বাবাকে তেমন ভয় পান না—মাসিমার সামনে বাবার রাশভারি মেজাজটাও একটু হালকা হয়ে যায়। জ্যাঠাইমা কথায় কথায় বলতেন, সীতার কাছে ঠাকুরপো জব্দ। ওইরকম লোকের এইরকম বৌ হওয়া উচিত। কালোয় কালোয় মানাবেও ভাল। মাসিমা বলতেন—জব্দ শুধু ঠাকুরপো কেন, জব্দ তুমিও হবে।

মাসিমা রান্না ঘরের কাছে এসে বললেন—খেতে এলুম। প্রভাত কাকা বললেন মেনুটা দেখে অর্ডার দাও। এ ঘরটার নাম প্রভাত হোটেল। মাসিমা, পিসিমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন —ছোড়দি বুঝি! বিল্টু তুই একটু বড় হয়েছিস রে। মনে আছে তোর শেষ দুধের দাঁতটা আমিই ফেলে দিয়ে গিয়েছিলুম। এর মধ্যে তোর গোঁফ বেরিয়ে গেলরে, কি কান্ড! সময় কি ভাবে চলে যায়।

মাসিমা এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন—দিদির কি হয়েছে? সত্যি মাথা খারাপ, না অভিনয়! দিদির স্টকে অনেক রকম জিনিস থাকে। জামাইবাবুর সঙ্গে বিয়ের সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময় থেকেই ও কিন্তু ছোড়দার ওপর খেপে আছে। ওর ধারণা ছোড়দা জেনে শুনে ওকে ঠকিয়েছে।

পিসিমা বললেন—সে আর জানি না। নতুন বৌ বাড়িতে পা দিয়েই সেই যে গুম হয়ে বসলো, দু'দিন আর জলস্পর্শ করল না। মেজদার সঙ্গে কম দুর্ব্যবহার করেছে।

বাবা ডাকলেন—প্রভাত। —হাজির বলে, প্রভাত কাকা ছুটলেন।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন—প্রভাতদা কি রাঁধছিলেন না কি? কেন? মেয়েছেলে থাকতে ব্যাটাছেলে রাঁধবে কেন?

পিসিমা বললেন—ওই খাওয়া নিয়েই তো মেজবৌদির মাথা খারাপ হয়ে গেল। কেবলই ভাবতো আমি সব চুরি করে আমার ছেলেমেয়েদের খাইয়ে দিচ্ছি। মাসিমা অবাক হয়ে বললেন—ছি ছি, দিদির মনটা চিরকালই অপরিষ্কার রয়ে গেল। চল বিল্টু তোর জ্যাঠাইমাকে একবার দেখে আসি।

দক্ষিণের টেবিলে বড় মামা বিব্রত মুখে বসে আছেন। একদিকে বাবা, একদিকে প্রভাত কাকা, মাঝখানে সেই গোল গহনার বাক্সটা। বাবা বলছেন, বিমল, রেঙ্গুনের বৌদির সমস্ত গহনা আমি লিস্ট করে এর মধ্যে রেখে দিয়েছি। তুমি একে একে মিলিয়ে নাও। বড়মামা বলছেন—গহনা কি হবে ছোড়দা! এর মধ্যে গয়নার কথা আসছে কেন? দিদিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে নিয়ে গিয়ে আমি ভাল স্যাইকিঅ্যাট্রিস্টকে দেখাব।

বাবা বললে—না না গয়নার কথা আসছে বৈকি। ভীষণভাবে আসছে। তোমার দিদিকে তুমি চেন না। তুমি আত্মভোলা মানুষ, আমি তো হাড়ে হাড়ে চিনি। সাংঘাতিক ভাবে চিনি। এই গয়নাগুলো ওর মাথা খারাপের আর একটা কারণ। ওর হাতে আমি দিতে পারিনি, তোমার হাতে আমি তুলে দিলুম। কেবল একটা প্রার্থনা, তোমার কাছে

আমার একটা ভিক্ষেই বলতে পার।

বড় মামা অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা ভস করে বাক্সের ঢাকনাটা খুললেন। সামনে ঝুঁকে পড়ে হীরে বসানো সেই ছোট্ট নাক-ছাবিটা দু-আঙুলে তুলে নিলেন। বাবার হাতে ওটার কোনও শোভা নেই। শোভা ছিল মায়ের টিকোল নাকে। মুখটা নিচু থেকে উঁচু দিকে যখন তুলতেন বিন্দুর মত হীরেটা চুমকির মত ঝলসে উঠত। —এইটা বুঝলে বিমল, এইটা রেঙ্গুনের বৌদিরই ছিল সেই হিসেবে তোমার দিদিরই প্রাপ্য, কিন্তু বৌদি এটা বিন্টুর মাকে দিয়েছিল, মৃত্যুর ঠিক দশমিনিট আগে এটা তাঁর নাক থেকে খুলে নেওয়া হয়। আমার কাছে এই সামান্য জিনিসটার মুল্য তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এইটা আমি তোমাদের কাছে ভিক্ষে চাইছি। যা দাম লাগে আমি দিয়ে দেব। প্রয়োজন হলে বেশিও দেব। জিনিসটা হাতে নিয়ে উদাস মুখে বাবা তাকিয়ে আছেন। বড় মামার মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ভীষণ আমুদে মানুষ। সর্বক্ষণই হইহই ভালবাসেন। ঘোর প্যাঁচ বোঝেন না। ঘনঘন নস্যি নেন। বেশ বুঝতে পারছি একটু নস্যির জন্যে ছটফট করছেন। এদিকে বাবা যেভাবে চেপে ধরেছেন সহজে যে মুক্তি পাবেন সে আশা নেই। কথায় কথা বাড়তেই থাকবে। আজকে একেবারে চুল-চেরা হিসেবের দিন।

বড় মামা হঠাৎ বাবার হাতদুটো ধরে অনুরোধ করার মত গলায় বললেন—ছোড়দা, দিদির কথায় আপনি অপমানিত হয়েছেন, আমি দিদির হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গয়না টয়না সব আপনার কাছেই থাক। আপনার কাছে থাকা আর ব্যাঙ্কে থাকা একই কথা।

—না বিমল, গয়নার দায়িত্ব আর আমি নিতে চাই না। আমার কি এমন দায় পড়েছে, চিরকাল পরের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে! এসব বিষয়-বিষ তুমি হাটাও। সব তুমি নিয়ে যাও। লিস্ট আছে মিলিয়ে নাও। ওর বাইরে আমার কাছে আর কিছু নেই।

বাবা উঠতে যাচ্ছিলেন, মাসিমা এলেন। এতক্ষণ জ্যাঠাইমার ঘরে ছিলেন। বাবার চেয়ারের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে বাবার মাথার একটা উসকো চুল একটু টেনে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলেন। বাবা এতই উত্তেজিত কিছু বুঝতে পারলেন না। তবে এটুকু বুঝেছেন, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। বড় মামা, প্রভাত কাকা কেউই এই তুচ্ছ ঘটনাটা লক্ষ্য করার অবস্থায় নেই। মাসিমা বললেন—ছোড়দার আজ অফিস নেই। কথাটা শুনেই বাবা স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় আছে। কটা বাজল?

বড় মামাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে অনুনয়—এগুলো তুলে রাখুন ছোড়দা। ছোড়দা তুলে রাখুন।

গোল বাকসটা হাতে নিয়ে মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন—কি রে দাদা? বড়মামা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বাবা ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন। এখনও অনেক কাজ বাকি। মাসিমা বলছেন—বাকসটা বেশ, এত ভারি কেন রে? বাকসটা খুলেই

লাফিয়ে উঠলেন—একিরে! গয়না! মাসিমার মুখ দেখে মনে হল হঠাৎ গুপ্তধনের বাক্স খুলে ফেলেছেন। —গয়না কি হবে রে! বড় মামা ফিস ফিস করে বললেন—দিদিটার জন্য শালা কি যে বে-ইজ্জত হতে হয়! মাসিমা আরো ফিস ফিস করে বললেন—তোর শালাটা সামলা দাদা। মনে রাখিস কোথায় কার সামনে বসে আছিস।

—ভাগ শালা। এতক্ষণ চেপে চেপে বসে আছি। আমার কি এসব পোষায় নাকি! মিলে কুলী খাটানোর চাকরি করি, খাই দাই না-খাই, না-দাই বগল বাজাই। কোত্থেকে শালা এক পাগলী এসে জুটল। তুই বল সীতা, এ তোর সর্দি-কাশি, পেট খারাপ নয় যে মেরে দেব এক ট্যাবলেট! জিনিসটা কোথায়?

—কোন জিনিষটা? মাসিমা বুঝতে পারেননি। —আরে সেই পাগলীটা! নিয়ে যে যাব, কামড়ে দেবে না তো! বস্তায় ভরে নিয়ে যেতে হবে না কিরে? মাসিমা বললেন—যাঃ ইয়ারকি করিসনি। গুম মেরে ঘরের অন্ধকার কোণে বসে আছে। একটাও কথা বলছে না। চোখদুটো দেখলে তোর মনে হবে, মরে গেছে। মাইরী বলছি তুই দেখে আয়।

প্রভাত কাকা আগেই উঠে চলে গেছেন। বড় মামা আমাকে কাছে ডেকেই ইসারায় ঘরের দরজাটা দেখিয়ে বললেন—ভাগনে গার্ড। বুঝতেই পারছ। আমি দরজায় পাহারা দিতে গেলুম, বড় মামা ঝট করে টেবিল থেকে বাবার নস্যির ডিবেটা তুলে নিলেন।

মাসিমা গয়নার বাক্সটা নিয়ে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাবা তখন পেরেক ঝোলানো দড়ির ফাঁস থেকে দাড়ি কামাবার বুরুশটা খুলছেন। আমার জ্ঞান হওয়াতক বুরুশটা দেখছি। সরু হতে হতে ছবি আঁকার তুলির মত চেহারা হয়েছে। —ছোড়দা পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়! নিন তুলে রাখুন। কোথায় ছিল? আমি তুলে রাখছি। বাবা বললেন—না সীতা, এতো একটা হিসেব চুকল, এখনও আর গোটাকতক গোলমেলে হিসেব আছে। মেজদার অসুখের সময় খরচের হিসেবটা আমাকে কমপ্লিট করতে হবে।

—কমপ্লিট করে কি করবেন? —ওর নাকের ডগায় ছুঁড়ে ফেলে দেব। —কার নাকের ডগায়?—বুঝতে পারছোনা, তোমার দিদির নাকের ডগায়? —তার মাথায় কিছু আছে? —সে আমি জানি না। আমার কাজ আমি করে যাব। —হ্যাঁ কাজের মত কাজ অবশ্যই আপনি করবেন, অকাজ আপনাকে কেউ করতে বলেনি।

কথা বলতে বলতে মাসিমার নজর ঠিক তলার ট্রাঙ্কটার দিকে চলে গেছে। চাবির গোছাটা ঝুলছে। ওপরের ট্রাঙ্ক দুটো নামিয়ে তলার ট্রাঙ্কের ডালাটা মাসিমা খুলে ফেললেন। গয়নার বাক্সটা রাখতে গিয়ে পুরো ট্রাঙ্কটাই প্রায় গোছানো হয়ে গেল। মাসিমা চাবিটা আঁচলে বেঁধে রাখলেন। বাবা বেশ জব্দ হয়েছেন। মাসিমা সেই ধাতের মানুষ, বাবার ভুরু কোঁচকান দেখলে থমকে যান না। বাবার বিরক্তি, হাসি দিয়ে

ভাসিয়ে দেন। মাসিমা বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই পাথরচাপা থমথমে আবহাওয়াটা ভাঙতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রভাত কাকাকে রান্না ঘর থেকে বের করে দিলেন —মেয়েমহলে পুরুষের স্থান নেই প্রভাতদা। ছোড়দার মহলে চলে যান। বাবা ঢুকেছেন জ্যাঠাইমার ছেড়ে দেওয়া ঘরে। দুটো মুগুর ঢুকেছে, ডাম্বেল ঢুকেছে। ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত কোনও কিছুর পরোয়া করেন না। নিয়ম, নিয়ম। বেরিয়ে আসবেন ঘেমে নেয়ে। এইজন্যেই কি বাবাকে সকলে স্বার্থপর বলেন।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাবার গঙ্গার চান কেউ বন্ধ করতে পারবে না। মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন আমার লোহার শরীর। বাবা স্নানে যেতেই বড় মামা বললেন—ভাগনে এইবার একটু ম্যানেজ করে দাও। বড় মামার নস্যির ডিবে আর বাবার ডিবে দুটোই ভরে ফেললুম। বাবার ছোট ডিবেতে বড় কৌটো থেকে নস্যি ভরে দেওয়া আমার রোজের কাজ। বড় মামা বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ। ধরা পড়ে যাবে না তো?

বড় মামা রাস্তার দিকের জানালার ধারে সরে গিয়ে বেশ শব্দ করে এক টিপ নস্যি নিয়ে লাল চোখে ফিরে তাকালেন—এতক্ষণে ঠিক হল বুঝলে বিন্টু। ঝড়ের মত শব্দ করে নস্যি না নিলে ঠিক জমে না। পড়াশোনা কেমন-হচ্ছে? ছোড়দার বকুনি? খুব হচ্ছে? বড় মামা জানালার ধার থেকে সরে এলেন—ছোড়দা আসছেন। রোজ গঙ্গার চান!

—রোজ, —সেই তেলটা আছে, ভৃঙ্গরাজ! —হ্যাঁ একটু আছে। —দিদির ব্রহ্মতালুতে একটু অ্যাপ্লাই করে দেব? সীতা! বড় মামা হঠাৎ ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন—আরে দুটোর সময় আমার ডিউটি। আমি এখুনি চলে যাবরে। দিদিকে বেঁধে টেধে রেডি করে দে। ঝুলিয়ে নিয়ে যাব, না মাথায় করে নিয়ে যাব। চল চল আর দেরি করিসনি।

মাসিমা বললেন—চল চল কিরে! আমি আজ যাব না। —যাবি না মানে, তোকে রোববার দেখতে আসবে সেই রাজপুত্তুর। —সে কি এই রোববার নাকি! পরের রোববার তো। —যাঃ শালা, আমি একলা যাব নাকি? বড় মামা দুটো কান ধরে বললেন —আর বলব না। দ্যাখ আর একবারও শালা বলব না।

—তোর অভ্যেস দাদা। তুই বাবার সামনে শালা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা কান ধরে বসে থাকতিস।

—শালা কারা বলে জানিস, মহা মহা সাধকরা, বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী বিমল মুখার্জি।

উওরের বারান্দায় বাবার নাক ঝাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। বড় মামা ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে বুঝিয়ে দিলেন সব চুপ।

বাবা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কোঁচা পাট করছেন, পাটেপাটে টেনে টেনে। গেঞ্জির ওপর দিয়ে বুকের কাছে পৈতেটা অল্প বেরিয়ে আছে, ফাঁসের মত। পৈতেটা খুবই হলদে। অল্প দুরেই মেঝেতে খাবার ঠাঁই হয়েছে। মাসিমা জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে

মেঝে মুচছেন। বাবা এইটা খুব পছন্দ করেন। বলেন শাস্ত্রসম্মত মার্জনা। মেয়েদের এ-সব শেখা উচিত, জানা উচিত। পাতের ডানদিকে থাকবে নুন। থাকবে গেলাস। ঝকঝকে কাঁসার গেলাস। গায়ে এতটুকু জলের দাগ লেগে থাকবে না। ভাতটাকে বেশ গুছিয়ে ঠাস ফুলকপির মত করে দিতে হবে।

বাবাা সোজা হয়েই দেখলেন সামনে বড় মামা দাঁড়িয়ে। —আমি তা'হলে আসছি ছোড়দা। বাবা অবাক হয়ে বললেন—সে কি? এখুনি যাবে কি? খাওয়াদাওয়া করে দুপুরের দিকে যাবে। —না ছোড়দা, দু'টোর মধ্যে মিলে পৌঁছতে হবেই। চা, জলখাবার খেয়েছি। আমি আসি। বড় মামা নিচু হয়ে প্রণাম করলেন।

—কি ভাবে যাবে! বাবা একটু উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলেন। —প্রভাতকে দোব তোমার সঙ্গে? বড় মামা বললেন—না দরকার হবে না। দিদি তো কিরকম ঝিম মেরে আছে। চালালেই চলবে। টানা রিকসায় করে সোজা দমদম স্টেশানে চলে যাই, সেখান থেকে ট্রেন।

—ধর হঠাৎ যদি গোলমাল শুরু করে। বড় মামা ফস করে বললেন—ফেলে রেখে পালাবো। মাসিমার কানে গেছে—কি যে বলিস দাদা, ফেলে পালাবি কি করে! ছোড়দা ও ঠিক নিয়ে যাবে, কোনও গোলমাল হবে না।

—তাহলে একটা রিকসা ডাকার ব্যবস্থা হোক। বাবা বাইরে বারান্দার দিকে এগোতে লাগলেন। যাবার পথে জ্যাঠাইমা যে ঘরে রয়েছেন সেই ঘরের দিকে তাকালেন।

দরজার পাশটিতে জ্যাঠাইমা চুপ করে দাড়িয়ে আছেন অন্ধকারে। ফর্সা একটা ধুতি পরেছেন। মাথায় ঘোমটা। মুখটা মোমের মত সাদা। চোখের দৃষ্টি এত উদাস বলে না দিলে সাধিকার চোখ বলে ভুল হবে। মাথার কালো কোঁকড়া চুল কপালের সামনে অল্প ঝুলে আছে। বগলে সেই বর্মা বেতের সুটকেস। ভেতরে আছে, জপের মালা, গৌরাঙ্গের ছবি, একখন্ড গীতগোবিন্দ, জ্যাঠামশাইয়ের লেখা একগোছা পুরনো চিঠি, নিকেলের সাবানদানিতে কয়েকটা আংটি, একটা সরু হার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো, কয়েক গাছা চুড়ি। টুকিটাকি নানা জিনিস আছে ওই বেতের বাক্সে।

বড়মামা ডাকলেন—চল দিদি, চল। জ্যাঠাইমা কলের পুতুলের মত উঁচু চৌকাঠ ডিঙিয়ে বড় ঘরে এলেন। বড় ঘরের এসে উদাস মুখে উত্তরের বারান্দায় দিকে তাকালেন—আকাশ, নিমগাছ, রান্না ঘরের দিকের বারান্দার থামে একটা কাক, শিউলি গাছ ভাঙা পাঁচিলের গায়ে ফার্ণ, তেলাকুচো, পেয়ারাগাছের একটা ঝুঁকে পড়া ডাল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। পাতকোয় কেউ বালতি নামাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাতকোর গায়ে বালতি ঠুকে যাবার শব্দ হচ্ছে।

জ্যাঠাইমা এইবার অবাক হয়ে রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমার বড় ছবিটার দিকে তাকালেন। চোখের পলক পড়ছে না। তাকিয়ে আছেন, তাকিয়ে আছেন। ছবিটার তলাতেই ক্যালেন্ডারের ছবি—গরুর গলা জড়িয়ে বাঁশি হাতে শ্রীকৃষ্ণ। কি দেখছেন জ্যাঠাইমা?

হেরে গেছেন। রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমার আসনে বসতে পারলেন না।

বড় মামা ডাকলেন—দিদি চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় রিকসা এসেছে। ঠুং ঠুং করে শব্দ করছে।

মাসিমা এসে জ্যাঠাইমার হাত ধরলেন—চলো। জ্যাঠাইমা ফ্যালফ্যাল মুখে অন্ধকার ঘরের দিকে তাকালেন। মাসিমা ধরে ধরে নিয়ে আসছিলেন। জ্যাঠাইমা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। যে মুখে কোনও ভাব ছিল না সেই মুখই হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে উল্টো দিকের বাড়ির ভাঙা ছাদের বড় বড় ঘাস গাছগুলোর দিকে তাকালেন। চেয়ারটাকে সিঁড়ির দিকে ঘুরিয়ে বাবা বসে আছেন। জ্যাঠাইমা বাবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি ঠান্ডা, মুখটা পাথরের মত। খুব আস্তে বললেন—আমি আসছি।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বাবা ভাবতেও পারেননি জ্যাঠাইমা এত ভদ্র, এত সুন্দর গলায় শুধু বিদায় চাইবেন। বাবা নিজের দুটো হাত এক করে শান্ত গলায় বললেন—যাও, ভাল হয়ে এস, সেরে এস। বাবু আমার কাছে রইল। জ্যাঠাইমা আর একটাও কথা বললেন না। ক্ষয়া ক্ষয়া চটিটা পরে, বেতের বাক্স বগলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শেষবারের মত চেয়ার, টেবিল, বেনচি, মা দুর্গার ছবি, নিজের ঘর, বন্ধ কালো দরজার দিকে ফিরে তাকালেন।

বাবু একটা ঝলঝলে ইজের, শরীরের তুলনায় বড় গেঞ্জি পরে জ্যাঠাইমার পেছনে পেছনে নামছে। জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে তো! স্বভাবটাও ঠিক তাঁর মত। সাতচড়ে রা করে না। চোখে জল টলটল করছে, তবু হাত পা ছড়িয়ে বায়না ধরেনি—মার সঙ্গে যাবই। সিঁড়ির বাঁকটা ঘোরার সময় আমাকে একবার খালি বললে—আমাকেও যেতে দাওনা দাদাভাই। আমি যেন বাবার প্রতিনিধি! আমি ওকে ভোলাবার জন্যে বললুম--ধুস তুই কেন যাবি! বিমানের দাদুর শ্রাদ্ধে কাল আমাদের দুপুরে নেমন্তন্ন, ভুলে গেছিস বুঝি? বড় বড় লুচি, ছোলার ডাল, লেডিকিনি। বাবু চুপ করে গেল। জ্যাঠাইমা নিচের গলিতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বাড়িটা ছেড়ে যেতে যেন মন চাইছে না। অন্ধকার, অন্ধকার, বন্ধ ঘরগুলোর দিকে বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে রইলেন। আমার দিকে বার কয়েক তাকালেন, কিছু যেন বলতে চান। হঠাৎ আমার কাছে সরে এসে বললেন—তোর মা আসছে রে! বড় মামা রাস্তায় রিকসার কাছ থেকে বিরক্তিভরা গলায় বললে—মহা মুশকিল হল তো, সীতা দিদিকে নিয়ে আয় না। জ্যাঠাইমা আর একটু কাছে সরে এসে বললেন—নুন একদম খাবি না, নুন খেলে মানুষ মরে যায়।

জ্যাঠাইমা ধীর পায়ে রিকসার কাছে এগিয়ে গেলেন। মুখ তুলে বাড়িটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। হঠাৎ হাত তুলে নমস্কার করলেন। বড় মামা তাড়াতাড়ি বেতের বাক্সটা ধরে নিলেন। রিকসাওয়ালা সামনের পর্দাটা ফেলতে যাচ্ছিল, বড় মামা বারণ করলেন। রিকসাটা ঠুং ঠুং করে এগিয়ে চলেছে। গালের ওপর দিয়ে কি

একটা গড়িয়ে গেল। আঙুল দিয়ে দেখলুম। এ কি আমিও কাঁদছি! রাস্তা থেকে দোতলার জানালার দিকে একবার তাকালুম। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তির মত। চোখ ফিরিয়ে নিলুম। সন্তোষদা একটু কুঁজো হয়ে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে দোকান থেকে নেমে আসছেন।

বাবার একগাদা জামা কাপড় গেঞ্জি লুঙ্গি নিয়ে মাসিমা পাতকোতলায় বেশ ছড়িয়ে বসেছেন। ধুমধাম করে কাচা চলেছে। বাড়িটা এখন কত শান্ত! বড় ঘরে দরজার সামনে প্রভাত কাকা একগাদা জ্যোতিষীর বই নিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে বসেছেন। নিজের কোষ্ঠী নিজেই বিচার করছেন। একটু আগে বাবুকে কথা দিয়েছেন বিকেলে সাইকেলের রডে বসিয়ে বহু দূরে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

দু'দিন পরে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকেছি। মেঝেটা তেলা। ঠিক লাল নয় একটু সাদাটে। চুল ফাটা হয়ে গেছে। জ্যাঠাইমার জীবনসঙ্গী মাদুরটা গোল করে গুটিয়ে এক কোণে দাঁড় করানো। হাতপাখাটা আর এক কোণে। ইজিচেয়ারটা দু'ভাঁজ করে দেয়ালে দাঁড় করানো। জ্যাঠামশাইয়ের কাঁচ ভাঙা ছবিটা দেয়ালে একপাশে কাত হয়ে ঝুলছে। নখের আঁচড়ে জায়গায় জায়গায় সাদা হয়ে গেছে। আলমারির একটা কাঁচ ভেঙে গেছে। তালাটা লাগানো আছে। ভাঙা জায়গাটা দিয়ে গোটাকতক বড় বোতল ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে। গৌরাঙ্গর ছবিটা যে জায়গায় ঝুলতো, সে-জায়গাটা খালি, ঝুলের ফ্রেমে খানিকটা সাদা শূন্যতা অনেকদিনের একজনের চলে যাবার কথা ঘোষণা করছে।

বড় বড় দুটো জানলায় সোজা সোজা গরাদ। বাইরে মেঘলা আকাশ। মেঘের কোলে মেঘ, যেন সারি সারি পাহাড় আকাশের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাঠাইমার তেলচিটে বালিসটা একপাশে অনাদরে পড়ে আছে। জানলার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। দুপুরের রাস্তা, প্রায় জনশূণ্য। পাশের বাড়ির রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে। আর দাঁড়ান যায় না, বসে পড়লুম। মেঝেতে পাতলা ধুলো জমেছে। জানলার তলায় জল বেরোবার ফুঁটোর কাছে লাল পিঁপড়ে মাটি তুলেছে। সাদা সাদা ডিম-মুখে সারি বেয়ে কোথায় চলেছে। বোধহয় বাসা বদল করছে। কিংবা বৃষ্টি আসবে।

মেঝের সেই জায়গাটায় চোখ চলে গেল। গোটাকতক পেরেক পোঁতা রয়েছে। এ ঘরটা মৃত্যুর ঘর। এই ঘরে মা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই, তার আগে হয়ত আরও অনেকে মারা গেছেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে একটি করে পেরেক মেঝেতে ঠোকা হয়েছে। এই নাকি নিয়ম। সাতটা পেরেকের মাথা মেঝের সঙ্গে মিশে আছে। একটা মাথা ওরই মধ্যে একটু উজ্জ্বল। টাটকা মৃত্যু। ওইটাই বোধহয় জ্যাঠামশাইয়ের। এটা কার? এটা বোধহয় মায়ের জন্যে। পেরেকের মাথা যদি মানুষের মাথার মত কথা বলতে পারত।

একটা ভিজে ভিজে গন্ধ নাকে এল। পাশের ঘরে দরজায় খিল দেবার শব্দ হল।

ভিজে কাপড় দু'পাট করে সাধুদের মত পরে মাসিমা এসেছেন। এক হাতে শুকনো শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া। মাসিমা বোধহয় আমাকে দেখতে পানি। গুন গুন করে কি একটা গান গাইছেন। মেয়েদের কাপড় ছাড়া দেখতে নেই। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকি। কি বোকাই ছিলুম আমি। বছর দুয়েক আগে কি করে বীরের মত বলেছিলুম—কিছু ভাববেন না জ্যাঠাইমা, মাসিমাকে কেউ বিয়ে না করলে, আমি বিয়ে করব। সেই নিয়ে কত হাসাহাসি। এখনও মাঝে মাঝে মেয়েমহলে প্রসঙ্গটা ওঠে, আর আমি লজ্জা পাই। কেন বলেছিলুম কে জানে। মাসিমাকে সমবয়সী ভাবতুম বলে? না কি আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন বলে। শ্যামনগরে গেলেই আমার হাত ধরে বাগানে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরতেন, কখন কুল, কখন পেয়ারা পেড়ে দিতেন, কখন কাদি থেকে ছিঁড়ে দিতেন পাকা কলা।

—কি রে বিণ্টু? মাসিমা দেখতে পেয়েছেন। দুটো ঘরের মাঝের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সায়ার দড়িতে ফাঁস লাগাচ্ছেন। শাড়িটা মেঝেতে পড়ে আছে। দড়ি বাঁধতে বাঁধতেই মাসিমা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পায়ের চেটোয় বিন্দু বিন্দু জল। পায়ের গোছের অনেকটা বেরিয়ে আছে। হালকা লোম জলে ভিজে জুড়ে আছে। একটা ঠাণ্ডা ভাপ মুখে এসে লাগছে। নাকে লাগছে সোডা সাবানের গন্ধ।

—এভাবে বসে আছিস কেন এখানে? মাসিমা হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে পড়লেন। —মন খারাপ হয়েছে বুঝি! হাত দিয়ে মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। বুক আর কোলের গরমে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। দু'হাত দিয়ে জোরে আরো জোরে মাসিমা আমার মুখটা তাঁর নরম বুকে চেপে ধরতে ধরতে বলছেন—বল, আমাকে মা বল, বল, আমাকে মা বল। বুক আর কোলের মাঝখানের অদ্ভুত অজানা উষ্ণতা থেকে আমার মুখ মা উচ্চারণ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার মায়ের ফর্সা পানের মত মুখ টিকলো নাক হীরের নাকছাবি। মাসিমা পাগলের মত আমাকে চুমু খাচ্ছেন। আমার চোখের জলে ব্লাউজের সামনের দিকটা ভিজে গেছে।

দুপুরেই জ্বর এল বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যের দিকে বেশ হাঁসফাঁস অবস্থা। পাটা ফুলে ঢোল। আর চেপে রাখা গেল না। মাসিমা বললেন—তোর মত বোকা আর ভীতু ছেলে পৃথিবীতে দুটি নেই। তুই বকুনির ভয়ে পায়ের কথাটা চেপে গেছিস। তবু আমি অনুরোধ করলুম—বাবাকে বলবেন না, উনি আসার একটু আগে আমি কোনরকমে উঠে পড়তে বসে যাব।

—যাওয়াচ্ছি বাছাধন। গরম জল করে আমি, তারপর বরিক পাউডার দিয়ে কমপ্রেস। পেঁকে পুঁজ হয়ে গেছে রে। ছোড়দা আসার অপেক্ষায় বসে থাকলে তো চলবে না দেখছি। এখুনি একজন ডাক্তার দরকার। তখন তো ডাক্তারখানাও সব বন্ধ হয়ে যাবে। প্রভাতদারও পাত্তা নেই। মাসিমা ঘরবার করছেন। কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

এদিকে বড় ঘরে আমাদের বিছানা হয়েছে। মশারিও পড়েছে। সন্ধ্যায় সাংঘাতিক

মশা। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি। কানে সব কিছুই আসছে। কেবল নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। মালাদি একবার এসে অনেকক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেছে। গদাইদা গল্প শুনিয়ে গেছে। পিসিমা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জ্যাঠাইমাকে গালাগাল দিয়ে গেছেন—জানো না সীতা মন্তর শক্তি ভীষণ শক্তি। মাসিমা পিসিমাকে এক কথায় চুপ করিয়ে দিয়েছেন—দিদি নেই দিদির কথাও আর হবে না। এখন অন্য কথা।

মাসিমা আমার পাশে এসে কাত হয়ে শুয়ে আছে। একটা হাত আমার মাথায়।—কি করি বল তো বিল্টু। গরম জল করলুম কিন্তু একটু বরিক আর তুলো খুঁজে পেলুম না রে। এতগুলো চাবির একটা চাবিতেও ওঘরের আলমারিটা খোলা গেল না। এ চাবিগুলো কিসের বলতো। সেই সকালের আঁচলে বাঁধা চাবিগুলো নিয়ে মাসিমার আক্ষেপ। আমিই এখন মাসিমাকে ভোলাবার চেষ্টা করি—কিচ্ছু হবে না মাসিমা, কাল সকালেই সেরে যাবে। আমি পা-টা বরং বালিশের ওপর উঁচু করে রাখি। সরসর করে পুঁজটা নিচের দিকে নেমে যাবে। বাবা তো আমাকে বলেছেন—তুই মা মরা ছেলে, জীবনে তোকে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে।

মাসিমা কপালে হাত বুলোচ্ছিলেন। হাতঠা থেমে গেলে—দুপুরের কথা তুই বুঝি ভুলে গেছিস। আমাকে কি বলে ডেকেছিস! আমার কানটা তখন অন্যদিকে চলে গেছে—ঝোপঝাড়ে ঘেরা উত্তরের দিকের বস্তি বাড়ির সেই মহিলা সুর করে রামায়ণ পড়ছেন দাওয়ায় বসে, রোজ যেমন পড়েন—মৃগয়া করিতে রাজা করেন গমন। হস্তী ঘোড়া রাজার চলিল শতে শতে। মৃগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে। ...অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন। ...দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে। অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে। কলসীতে ভরে জল সেই সরোবরে। কলসীর মুখ করে বুকবুক ধ্বনি। রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী।

মাসিমার হাতটা আমার কপালে খেলা করছে। মাসিমার নাকটা নামতে নামতে আমার কপালে এসে ঠেকেছে। আরও দূরে বোষ্টম বাড়িতে খোল করতাল বাজছে। এইবার সিন্ধু মরবে...শব্দ ভেদী বাণ রাজা শব্দ মাত্র হানে। পুত্রপরে বাণ পড়ে সেইক্ষণে।। দশরথের কি অবস্থা।...মৃগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি। মৃগ নহে মুণি পুত্র যায় গড়াগড়ি। কে সিন্ধু। না আমি বাবু!—তোর জ্বরটা খুব বেড়েছে বিল্টু। দেখি কি করা যায়। দশরথ সিন্ধুর প্রাণহীন দেহ কাঁধে নিয়ে অন্ধক মুনির আশ্রমের দিকে চলেছেন। জয়মিত্রের কালী বাড়িতে সন্ধ্যারতির জগঝম্প বাজছে। অনেক অনেক বছর আগে, মা আর আমি আর আমার রেঙ্গুনের জ্যাঠাইমা শীতকালের এক সন্ধ্যায় আরতি দেখতে গিয়েছিলুম। দু'জনেরই গায়ে একই রকম নীল সোয়েটার, পায়ে একইরকম সাদা ডোরা কাটা জুতো। এক বৃদ্ধা বলছেন—দ্যাখ দ্যাখ দু'বোনের একই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে।

—টর্চটা ফেল প্রভাত, হ্যাঁ হ্যাঁ আঙুলটার ওপর ফেল। বাবার গলা না! ইস এতো

সেপটিক হয়ে গেছে, মিস্টার চ্যাটার্জি!—এ কার গলা? ডকটর জয়ন্ত সেন? সেই টুকটুকে সাহেব? মাকে দেখেছেন, জ্যাঠাইমাকে দেখেছেন, জ্যাঠামশাইকে দেখেছেন। —টেম্পারেচার কত? — দেখা হয়নি! মাসিমার গলা, না মার গলা।—কি করেন? আপনারা সব এডুকেটেড লোক এ-রকম ইললিটারেটের মত কাজ করেন কেন? ছেলে-পুলের বাড়ি একটা থার্মমিটার অবশ্যই রাখবেন। দেখি টর্চটা আমার হাতে দিন।

বেশ আরাম লাগছে। আঙুলের মাথায় গরম সেঁক। জল গড়াচ্ছে বুড়ো আঙুলের পাশ দিয়ে। আমি একবার বৃষ্টির পরের দিন, পাশের ঘাসে ঢাকা মাঠে জমে থাকা জলের ওপর দিয়ে হেঁটেছিলুম। তখন আমার এইরকম লেগেছিল। পেটা ঘড়িতে কটা বাজছে.....এক, দুই, তিন...বারোটা।—নার্ভাস হবার কিছু নেই সীতা, ডোন্ট গেট নার্ভাস। ওরকম একটু আধটু হবেই। শরীর থাকলেই তার খাজনা দিতে হবে। এসেছে যখন ভবে থাকার মাসুল দিতে হবে। একটু ঘুম, একটু তন্দ্রা, যন্ত্রনা কখনও কম, কখনও বেশি। কোথাও তো কোনও আলো নেই। কোনও শব্দ নেই। আমি কি ঠিক শুনছি, বাবার গলাই তো—অনেক রাত হল, অনেক সেবা করেছ, ঘুমুচ্ছে, তুমি এখানেই, এবার শুয়ে পড় সীতা।—বালিস? মাসিমারই তো গলা। —এই তো আমার হাতে মাথা রাখ।—ওরা?—ওরা কোথায়! সবাই তো ঘুমাচ্ছে। কে হাসছে! কার হাসি। আর তো আমার জেগে থাকা উচিত নয়।

দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির ন্যাড়া ছাদে। খুব রাত। কাঁচের মত ঝকঝকে নীল আকাশ কত নিচে নেমে এসেছে। ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে অসংখ্য তারা। খুব শীত করছে যেন। সামনের বাড়ির ছাদে প্রাণধনবাবু। এক মাথা সাদা চুল। হাতে ম্যাপ পয়েন্ট আউট করার সেই সরু লাঠিটা। ইউ বিল্টু। লুক হিয়ার। তাকাও ওপরে। এটা কি কনস্টিলেশান? দাঁড়াও ঘড়িটা দেখি। রাত আড়াইটে। এটা হল কালপুরুষ। মৃগয়ায় বেরিয়েছে। এই দেখ মাথা। একটা তারার গায়ে সরু লাঠিটা ঠেকালেন, লাঠির মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল। এই দেখ কোমরের বেল্ট। এই দেখ ধনুক। প্রত্যেকটা তারার গায়ে লাঠিটা ঠেকাচ্ছেন আর প্রতিবারই লাঠির মাথাটা জ্বলে জ্বলে উঠছে। অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ লুব্ধক। শিকারী কালপুরুষের ফেথফুল ডগ। এইবার লাঠিটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেই আলোতে দেখলুম ছাদের আর এক কোণ থেকে হর্ষবাবু বাঘের মত এগিয়ে আসছেন—হু আর ইউ, আপনি দেখাবার কে! আমি হেডমাস্টার, আমি দেখাব। হোয়ার ইজ দি স্টিক? স্কুলের লাঠি আপনি পুড়িয়েছেন। আপনাকে আমি নিল-ডাউন করিয়ে রাখব। লুক হিয়ার বিল্টু। আমি হাত দিয়েই দেখাচ্ছি। এই হল শিকারী কালপুরুষ, মৃগয়ায় বেরিয়েছে। দেখি কটা বাজল! আড়াইটে। এই হল মাথা। হাতটা তুলতেই আকাশটা সরতে আরম্ভ করল। হর্ষবাবু ভীষণ চেষ্টা করছেন কিন্তু ক্রমশই ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। হর্ষবাবু চেষ্টা করছেন আকাশ ছোঁবার। এরিয়েলের বাঁশটা খুলে নিয়ে লেংচে লেংচে আকাশের গায়ে ঠেকাবার চেষ্টা

করছেন—লুক হিয়ার বিন্টু লুক হিয়ার। হর্ষবাবুর রকম দেখে প্রাণধনবাবু খুব হাসছেন, মাথার সাদা চুল কপালের চারপাশে ঝুলছে।

উঠতে উঠতে আকাশটা আকাশের চেয়েও দূরে চলে গেল। প্রাণধনবাবু আর হর্ষবাবু হাত-পা নাড়া পুতুল-নাচের পুতুলের মত ছাদের আলসেতে ঝুলে পড়লেন। দৃশ্যটা হারিয়ে গেল। এ আমি কোথায়! রাজবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। একবারে নদীর ধারে। বিশাল ছাদ। দূরে আলসের ধারে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে কে!—মা তুমি!—ওই দ্যাখ বিন্টু পালতোলা নৌকা করে আমার রাজা চলে যাচ্ছে মৃগয়ায়! হাঁসের মত সাদা পাল তুলে ময়ূরপঙ্খী ভেসে চলেছে নীল জলে।—তুমি আমার মা। তাই তো! তাহলে মাসিমা কি করে মা হয়।—দূর পাগল, ছানা ছাড়া রসগোল্লা হয়? তুইও যেমন। দাঁড়া বলে দি, তা না হলে আবার ভুল করবে। মা চিৎকার করে বলছেন- হরিণ ভেবে অন্ধক মুণির ছেলেকে যেন মের না, তা হলে রামকে বনবাসে যেতে হবে।

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাবার গলাই যেন শুনলুম—তা না হলে তুমি পুত্রবতী হবে কি করে।

মা যেন থতমত খেয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকালেন। মুখে হঠাৎ হাসি খেলে গেল—সেই অসাধারণ গালে টোল খাওয়ানো হাসি। একটা হাত এগিয়ে এসে আমার মাথা স্পর্শ করল। অনামিকায় সেই পোখরাজের আংটি। আর একটা হাত মুখের পাশে রেখে খুব জোর গলায় বললেন—আমি তো পুত্রবতী! এই তো আমার পুত্র, তুমি ফিরে এস।

বহু দূর থেকে বাবার গলা ভেসে এল, বড় করুণ গলা—আমি যে বেরিয়ে পড়েছি তুলসী।